HSB

স্বাস্থ্য ও বিজ্ঞান বার্তা

বর্ষ ১০ • সংখ্যা ৩ • সেপ্টেম্বর ২০১২
আইএসএসএন ১৭২৯-৩৪৩এক্স

অন্যান্য পাতায়

পৃষ্ঠা ৯

বাংলাদেশে হাসপাতালের ভৌত-পরিবেশ থেকে সংক্রমণের ঝুঁকি

পৃষ্ঠা ১৫

বাংলাদেশে ম্যালেরিয়া-প্রবণ একটি প্রত্যন্ত জেলায় ম্যালেরিয়া সনাক্তকরণ এবং চিকিৎসায় মোবাইল ফোনের ব্যবহার

পৃষ্ঠা ২০

সার্ভিলেন্স আপডেট

বাংলাদেশে বাড়ির আঙ্গিনায় হাঁস-মুরগি পালনের অভ্যাস এবং মানুষের মধ্যে এভিয়েন ইনফ্লুয়েঞ্জা-সংক্রমণের ঝুঁকি

হাঁস-মুরগি থেকে মানুষের মধ্যে রোগ সৃষ্টিতে উচ্চ-ক্ষমতাসম্পন্ন এভিয়েন ইনফ্লুয়েঞ্জা এ-এর সাবটাইপ এইচ৫এন১-এর সংক্রমণ প্রতিরোধে ১০টি সতর্কতামূলক ব্যবস্থা সম্পর্কে গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার ২০০৭ সালের মার্চ থেকে গণমাধ্যমের সাহায্যে প্রচারাভিযান চালিয়ে যাচ্ছে। বাড়ির আঙ্গিনায় হাঁস-মুরগি পালনকারীদের এভিয়েন ইনফ্লুয়েঞ্জা বা বার্ড ফ্লুসংক্রান্ত জ্ঞান আছে কি না এবং সুপারিশকৃত সতর্কতামূলক ব্যবস্থাসমূহ তারা অনুসরণ করছে কি না তা নির্ধারণের জন্য আমরা এই গবেষণাটি পরিচালনা করি। ২০০৯ সালের মে থেকে ২০১১ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আমরা দৈব-চয়নের ভিত্তিতে নির্বাচিত ৯০টি গ্রাম থেকে বাড়ির আঙ্গিনায় হাঁস-মুরগি পালনকারী ১,৮৮৩ জন মুখ্য ব্যক্তির সাক্ষাৎকার গ্রহণ করি। উত্তরদাতাদের অর্ধেকেরও বেশি (৫৬%) কখনোই বার্ড ফ্লু সম্পর্কে কিছু শোনেন নি এবং বাড়ির আঙ্গিনায় হাঁস-মুরগি পালনকারী মুখ্য ব্যক্তিরা সরকারকর্তৃক সুপারিশকৃত সতর্কতামূলক ব্যবস্থাসমূহ কদাচিৎ অনুসরণ করেছেন। যেসব ব্যক্তি বার্ড ফ্লু সম্পর্কে শুনেছেন সরকারকর্তৃক সুপারিশকৃত সতর্কতামূলক ব্যবস্থাসমূহ মেনে চলার সম্ভাবনা তাদের মধ্যে বেশি ছিলো। অভীষ্ট জনগোষ্ঠির মধ্যে সংক্রমণের ঝুঁকি কমানোর লক্ষ্যে সুপারিশকৃত সতর্কতামূলক ব্যবস্থাসমূহের গ্রহণযোগ্যতা এবং বাস্তবায়নের উপযোগিতা যাচাইয়ের জন্য এগুলোর পুনর্মূল্যায়ন করা উচিত।

icddr,b

KNOWLEDGE FOR GLOBAL LIFESAVING SOLUTIONS

এ-গবেষণার সুপারিশ হচ্ছে: সতর্কতামূলক বার্তাসমূহ পাঠানোর জন্যে যোগাযোগের সর্বোত্তম মাধ্যম চিহ্নিত করতে হবে যেন আরো অনেক গ্রামীণ এলাকায় বাড়ির আঙ্গিনায় হাঁস-মুরগি পালনকারীদের কাছে বার্তাসমূহ পৌঁছাতে পারে।

বিশ্বের সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ দেশসমূহের মধ্যে বাংলাদেশ একটি, যেখানে প্রতি বর্গকিলোমিটারে ১,০৭৫ জন মানুষ বসবাস করে (১)। বাংলাদেশে হাঁস-মুরগির ঘনত্বও অনেক বেশি যেখানে প্রতি বর্গকিলোমিটারে ১,৪৬০টি হাঁস-মুরগি রয়েছে এবং দেশের ৫০% হাঁস-মুরগিই বাড়ির আঙ্গিনায় লালনপালন করা হয় (১,২)। মানুষ এবং হাঁস-মুরগির এই উচ্চ ঘনত্ব এই দুই শ্রেণীর প্রাণীদেরকে ঘনঘন একে অপরের সংস্পর্শে আসার সুযোগ সৃষ্টি করে এবং হাঁস-মুরগি থেকে মানুষের মধ্যে সংক্রামক রোগের বিস্তার ঘটায় (৩)। রোগাক্রান্ত হাঁস-মুরগি ধরা ও জবাই করা এবং হাঁস-মুরগির কাঁচা মাংস ও ডিম নাড়াচাড়া করার সময় এভিয়েন ইনফ্লুয়েঞ্জার জীবাণু নিঃশ্বাসের মাধ্যমে অথবা চোখের মাধ্যমে সাধারণত মানবদেহে সংক্রমণ ঘটায় বলে মনে করা হয় (৪,৫)। ২০০৭ সাল থেকে আজ পর্যন্ত বাংলাদেশের ৬৪টি জেলার মধ্যে ৫২টি জেলায় হাঁস-মুরগির মধ্যে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন এভিয়েন ইনফ্লুয়েঞ্জা এ-এর সাবটাইপ এইচ৫এন১ ভাইরাসের সংক্রমণ নিশ্চিত করা গেছে এবং বাড়ির আঙ্গিনায় পালিত হাঁস-মুরগির মধ্যে উক্ত ভাইরাস দ্বারা ৫৭টি প্রাদুর্ভাবের কথা আনুষ্ঠানিকভাবে জানা গেছে (চিত্র ১)। ঢাকায় অবস্থিত আইসিডিডিআর,বি-র কমলাপুর সার্ভিলেন্স এলাকায় ২০০৮ সালে একটি শিশু এবং ২০১১ সালে আরো দুটি শিশু এইচ৫এন১-এ আক্রান্ত হয়েছিলো (৬,৭)। ২০১২ সালে ঢাকায় হাঁস-মুরগির বাজারের তিনজন প্রাপ্তবয়স্ক কর্মীকে পরীক্ষা করে তাদের মধ্যে এইচ৫এন১-এর সংক্রমণ পাওয়া গেছে (৮,৯)। উক্ত ছয়জনের সকলেই হাঁস-মুরগির নিবিড় সংস্পর্শে এসেছিলো বলে জানা যায়। যদিও বাংলাদেশে সনাক্তকৃত সকল এইচ৫এন১ ভাইরাস-আক্রান্ত রোগীর মৃদু অসুস্থতা ছিলো, ২০০৩ সাল থেকে বিশ্বব্যাপী ৬০৭ জন নিশ্চিত এইচ৫এন১ রোগীর মধ্যে ৩৫৮ জন মারা যায় (১০)।

মানুষের মধ্যে এইচ৫এন১ সংক্রমণ প্রতিরোধে সুপারিশকৃত সতর্কতামূলক ১০টি ব্যবস্থা প্রচারের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার পহেলা মার্চ ২০০৭ থেকে গণমাধ্যমে প্রচারাভিযান পরিচালনা করে আসছে (সারণি ১) (১১)। বিভিন্ন সময়ে রেডিও, টেলিভিশন, খবরের কাগজ এবং সভার মাধ্যমে এই বার্তাসমূহ প্রাণিসম্পদ বিভাগের (ডিএলএস) সরকারি পশুরোগবিষয়ক কর্মকর্তাদের নেতৃত্বে এবং বিশ্ব ব্যাংক ও বাংলাদেশের অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগীদের [যাদের মধ্যে রয়েছে খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও), বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও), জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (ইউএনডিপি), জাতিসংঘ শিশু তহবিল (ইউনিসেফ), ইউনাইটেড স্টেটস এজেন্সি ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট (ইউএসএআইডি), ড্যানিশ ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি (ড্যানিডা), এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (এডিবি) এবং জাপান সরকারের] সহযোগিতায় প্রচার করা হয় (১১)। এই সুপারিশসমূহ ডব্লিউএইচও, এফএও এবং জাপান সরকারের সহযোগিতায় প্রকাশিত ইউনিসেফ-এর একটি প্রকাশনা থেকে নেওয়া হয়েছে (১২)। এই গবেষণার লক্ষ্য ছিলো এভিয়েন ইনফ্লুয়েঞ্জা সম্পর্কে হাঁস-মুরগি পালনকারীদের জ্ঞান যাচাই করা এবং হাঁস-মুরগি পালনে বাংলাদেশ সরকারের সুপারিশকৃত সতর্কতামূলক ব্যবস্থাসমূহের সাথে বর্তমানে প্রচলিত অভ্যাসের তুলনা করা।

২০০৯ সালের মে থেকে ২০১১ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আইসিডিডিআর,বি-র গবেষণাদলটি 'জনসংখ্যা অনুপাতে সম্ভাব্যতা' (প্রবাবিলিটি প্রোপোরশনেট টু পপুলেশন সাইজ) পদ্ধতির

চিত্র ১: ২০১১ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে রিপোর্টকৃত বাংলাদেশের ৫৭টি উপজেলায় বাড়ির আঙ্গিনায় পালিত হাঁস-মুরগির মধ্যে এভিয়েন ইনফ্লুয়েঞ্জা এ/এইচ৫এন১ প্রাদুর্ভাবের বিন্যাস

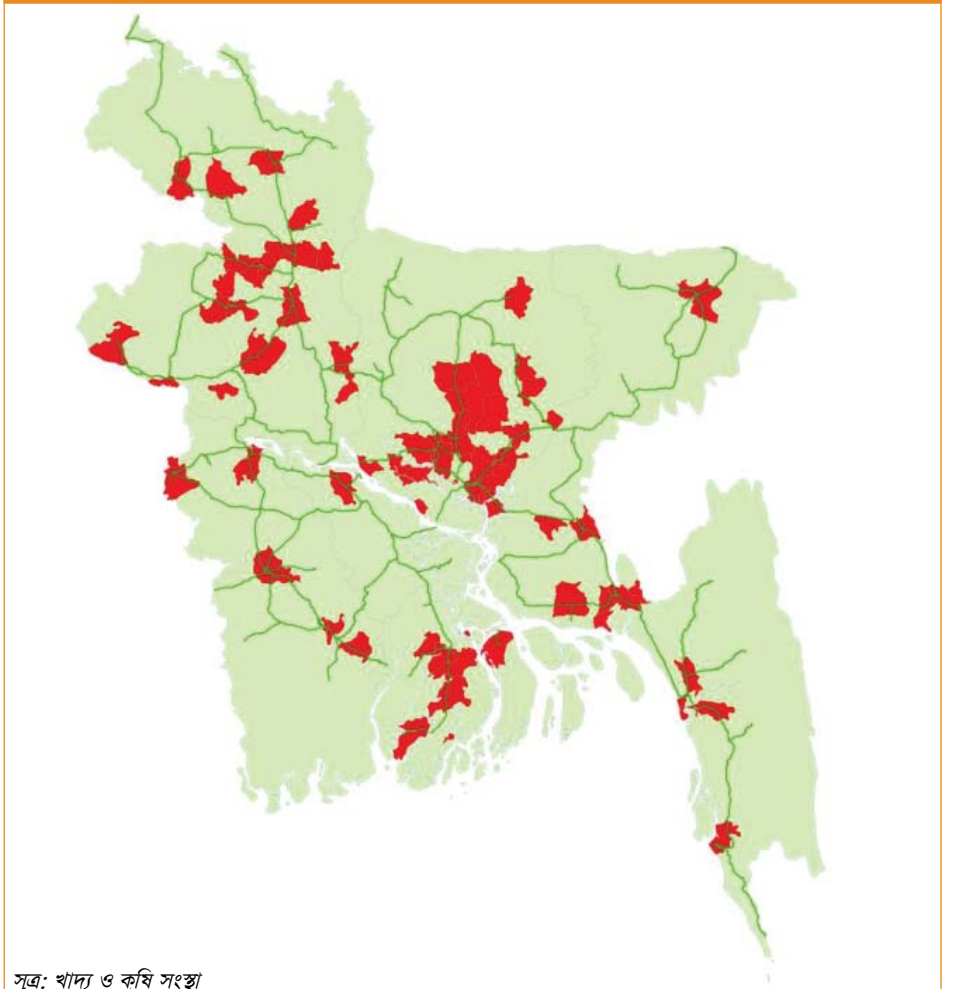

সূত্র: খাদ্য ও কৃষি সংস্থা

সাহায্যে বাংলাদেশের ৯০টি গ্রামের ক্লাস্টার নির্বাচন করা হয়। একটি নির্বাচিত গ্রামে পৌঁছার পর গবেষণাদলটি গ্রামের বাসিন্দাদের ওই গ্রামের সবচাইতে জনপ্রিয় চায়ের দোকানটি দেখাতে বলেন। চায়ের দোকানটি থেকে নিকটতম বাড়িটি চিহ্নিত করেন। যদি গ্রামে কোনো চায়ের দোকান না-থাকে তাহলে গবেষণাদলটি গ্রামের বাসিন্দাদের কাছে ওই গ্রামটির মধ্যবর্তী স্থান নির্বাচন করতে বলেন, যা গবেষণা শুরুর স্থান হিসেবে ব্যবহার করা হয়। একটি খানা তালিকাভুক্তির পর দলটি পরের নিকটবর্তী দুটি খানা বাদ দিয়ে সম্মুখবর্তী এমন একটি খানা নির্বাচন করেন যে-খানায় অন্তত একটি বা ৫০টির কম হাঁস-মুরগি ছিলো। নির্বাচিত গ্রাম থেকে ২০টি খানা তালিকভুক্ত না-হওয়া পর্যন্ত একই প্রক্রিয়া অনুসরণ করে তালিকাভুক্তির কার্যক্রম চলতে থাকে। প্রতিটি খানার হাঁস-মুরগি পালনকারী মুখ্য

ব্যক্তির নিকট থেকে লিখিত সম্মতি পাওয়ার পর গবেষকগণ একটি কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নমালার সাহায্যে হাঁস-মুরগি পালনে প্রচলিত অভ্যাসসংক্রান্ত তথ্যাদি সংগ্রহ করেন। অংশগ্রহণকারীদের উত্তরের সংখ্যা সঠিকভাবে নিরূপণের জন্য আমরা পরিসংখ্যানসংক্রান্ত সফটওয়ার 'স্ট্যাটা ১০.১০' ব্যবহার করি এবং আমাদের পর্যবেক্ষণের আওতাভুক্ত ক্লাস্টারসমূহ বিবেচনায় রাখার জন্য আমরা জেনারালাইজড এস্টিমেটিং ইকোয়েশন (জিইই) পদ্ধতি ব্যবহার করি। যারা এভিয়েন ইনফ্লুয়েঞ্জা সম্পর্কে শুনেছিলেন এবং এভিয়েন ইনফ্লুয়েঞ্জা সম্পর্কে শোনেন নি এই দুটি দলের ভিত্তিতে আমরা উত্তরদাতাদের হাঁস-মুরগি পালনসম্পর্কিত অভ্যাসসমূহ বিন্যস্ত করি এবং রিগ্রেশন অ্যানালাইসিস ক্লাস্টারের জন্য সমন্বিত করে এই দুটি দলের উত্তরের সংখ্যাগত উল্লেখযোগ্য কোনো পার্থক্য আছে কি না তা নির্ণয়ের জন্য শতকরা হারে তুলনা করি। এই প্রটোকলটি আইসিডিডিআর,বি-র রিসার্চ রিভিউ কমিটি এবং ইথিক্যাল রিভিউ কমিটি অনুমোদন করে।

সারণি ১: হাঁস-মুরগি থেকে মানুষের মধ্যে এভিয়েন ইনফ্লুয়েঞ্জার সংক্রমণ প্রতিরোধের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রণীত ১০টি সতর্কতামূলক ব্যবস্থা

১।	খালি হাতে অসুস্থ বা অস্বাভাবিকভাবে মৃত হাঁস-মুরগি বা অন্যান্য পাখি ধরা-ছোঁয়া ও নাড়াচাড়া করা যাবে না।
২।	বাড়িতে রোগে আক্রান্ত হাঁস-মুরগি জবাই করা বা পালক ছাড়ানো অথবা নাড়াচাড়া করা যাবে না।
৩।	রোগে আক্রান্ত হাঁস-মুরগি বা অন্যান্য পাখি ধরা-ছোঁয় ও সেগুলো নিয়ে খেলাধুলা করা থেকে শিশুদেরকে বিরত রাখতে হবে।
৪।	হাঁস-মুরগি বা পশুপাখি ধরা-ছোঁয়ার পর ভালো করে সাবান বা ছাই এবং পানি দিয়ে দুই হাত পরিষ্কার করে ধুতে হবে।
৫।	হাঁস-মুরগি বা পশুপাখি দেখাশোনা করার সময় কাপড় দিয়ে নাকমুখ ঢেকে নিতে হবে। পশুপাখি নাড়াচাড়ার পর সেই হাত না-ধুয়ে চোখ, নাক বা মুখে হাত লাগানো যাবে না।
৬।	হাঁস-মুরগির মাংস ভালোভাবে রান্না করতে হবে। আধা-সিদ্ধ মাংস, ডিম বা মাংসের তৈরি খাবার খাওয়া যাবে না।
৭।	বার্ড ফ্লু রোগ ছড়িয়ে পড়েছে এমন স্থানে বা তার আশেপাশে যারা বসবাস করে, তাদের জীবন্ত হাঁস-মুরগি ও অন্যান্য পাখি ক্রয়-বিক্রয় বা জবাই করার স্থানে যাওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে।*
৮।	রোগে আক্রান্ত হাঁস-মুরগি বা অন্যান্য পাখির মল সার অথবা মাছের খাদ্য হিসেবেও ব্যবহার করা যাবে না।
৯।	যদি কোথাও হঠাৎ হাঁস-মুরগি বা অন্যান্য পাখি অস্বাভাবিকহারে মারা যায় তবে সাথেসাথে ওয়ার্ড কমিশনার অথবা থানা পশু হাসপাতালে জানাতে হবে। মৃত হাঁস-মুরগি এবং পাখি মাটিতে পুঁতে ফেলার সময় অবশ্যই সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে।
১০।	হাঁস-মুরগি বা অন্যান্য পাখি ধরা-ছোঁয়ার পর যদি কেউ জ্বর-সর্দি-কাশিজাতীয় কোনো রোগে ভোগেন তবে তাড়াতাড়ি ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে। প্রয়োজনে নিকটস্থ স্বাস্থ্যকেন্দ্র/হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য যেতে হবে। রোগে আক্রান্ত বা মৃত হাঁস-মুরগির সংস্পর্শে আসার বিষয়টিও তাদেরকে জানাতে হবে।

**এই বিষয়টি প্রশ্নমালায় অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি*

আমরা বাড়ির আঙ্গিনায় হাঁস-মুরগি পালনকারী ১,৮৮৩ জনের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করি। এদের ৯৯% ছিলেন মহিলা, ৩৮% প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত লেখাপড়া শেষ করেছেন এবং ৩৭% কখনোই বিদ্যালয়ে যান নি। উত্তরদাতাদের ১৩%-এর বাড়িতে রেডিও এবং ৩১%-এর বাড়িতে টেলিভিশন ছিলো, তা সত্ত্বেও অনেক উত্তরদাতা কখনোই রেডিও শোনেন নি (৮৩%) কিংবা কখনো টেলিভিশন দেখেন নি (৪২%)। উত্তরদাতাদের অর্ধেকের বাড়িতে বিদ্যুৎ সংযোগ ছিলো না।

এভিয়েন ইনফ্লুয়েঞ্জাসংক্রান্ত জ্ঞান থাক বা না-থাক, ৮৫% উত্তরদাতা গতানুগতিকভাবে অসুস্থ অথবা মৃত হাঁস-মুরগি নাড়াচাড়া করেছেন, ৫৫% উত্তরদাতা বসতঘরের ভিতরে অসুস্থ হাঁস-মুরগি রেখেছেন,

৫২% অসুস্থ হাঁস-মুরগি জবাই করেছেন, ৪৭% হাঁস-মুরগির মল সার হিসেবে ব্যবহার করেছেন, ৪২% জানিয়েছেন যে, হাঁস-মুরগি নাড়াচাড়া করার পর তারা কখনো সাবান দিয়ে হাত ধোন নি এবং প্রায় কেউই (০.৪%) হাঁস-মুরগি নাড়াচাড়া করার সময় তাদের নাক ও মুখ কাপড় দিয়ে ঢাকেন নি। হাঁস-মুরগি পালনকারীদের ৩৯% জানিয়েছেন যে, শিশুরা হাঁস-মুরগি ধরেছে অথবা হাঁস-মুরগির সাথে খেলা করেছে এবং ১৭% উত্তরদাতা জানিয়েছেন যে, শিশুরা খাওয়ার জন্য হাঁস-মুরগি জবাই করেছে। ৬৮০টি খানার মধ্যে যারা সাক্ষাৎকার গ্রহণের পূর্ববর্তী দুমাসে হাঁস-মুরগির অস্বাভাবিক মৃত্যু লক্ষ্য করেছেন তাদের মধ্যে শুধুমাত্র ২% উত্তরদাতা হাঁস-মুরগির মৃত্যুসংক্রান্ত তথ্য কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছেন। হাঁস-মুরগি পালনকারীরা যখন ফ্লু-র মতো অসুস্থতায় আক্রান্ত হয়েছিলেন তখন তাদের ১৫% ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণ করেছিলেন বলে জানিয়েছেন। উত্তরদাতাদের তিন-চতুর্থাংশেরও বেশি (৮৪%) শুধুমাত্র একটি সুপারিশকৃত সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অনুসরণ করেন – আর তা হলো: জবাইকৃত হাঁস-মুরগি ভালোভাবে রান্না করে খাওয়া।

উত্তরদাতাদের এভিয়েন ইনফ্লুয়েঞ্জাসংক্রান্ত জ্ঞান নির্ধারণের জন্য আমরা তাদের প্রশ্ন করি, ''আপনি কি কখনো এভিয়েন ইনফ্লুয়েঞ্জা বা বার্ড ফ্লু-র কথা শুনেছেন?'' অর্ধেকের বেশি (৫৬%) উত্তর দিয়েছেন, 'না'। যারা বার্ড ফ্লু সম্পর্কে কখনো কোনো কিছু শোনেন নি তাদের তুলনায় যারা বার্ড ফ্লু সম্পর্কে শুনেছিলেন তাদের মধ্যে সুপারিশকৃত ৬টি সতর্কতামূলক ব্যবস্থা মেনে চলার সম্ভাবনা উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি ছিলো। মেনে-চলা ব্যবস্থাগুলো হলো: শিশুদের হাঁস-মুরগি ধরতে না-দেওয়া, অসুস্থ হাঁস-মুরগি খাওয়ার জন্য জবাই না-করা, হাঁস-মুরগি নাড়াচাড়া করার পর সাবান দিয়ে হাত-ধোয়া, স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে হাঁস-মুরগির মৃত্যুর তথ্য জানানো এবং ফ্লু-র মতো অসুস্থতা দেখা দেওয়ার সাথেসাথে চিকিৎসাসেবা নেওয়া (চিত্র ২)। যারা বার্ড ফ্লু সম্পর্কে শুনেছিলেন (সংখ্যা=৮২৩) তাদের মধ্যে ৬২% উত্তরদাতা হাঁস-মুরগির বার্ড ফ্লু-র অন্তত একটি লক্ষণ চিহ্নিত করতে পেরেছিলেন, ৩০% উত্তরদাতা মানুষের (এভিয়েন ইনফ্লুয়েঞ্জার) অন্তত একটি লক্ষণ চিহ্নিত করতে পেরেছিলেন এবং ৭১% উত্তরদাতা হাঁস-মুরগি থেকে মানুষের মধ্যে রোগ ছড়ানোর অন্তত একটি মাধ্যম চিহ্নিত করতে পেরেছিলেন। তবে ৭২% উত্তরদাতা জানতেন না কীভাবে এবং কোথায় হাঁস-মুরগির মৃত্যুর তথ্য জানাতে হবে এবং ২৪% উত্তরদাতা হাঁস-মুরগির মৃত্যুসংক্রান্ত তথ্য জানানো গুরুত্বপূর্ণ নয় বলে মনে করেছিলেন।

প্রতিবেদক: জুনোটিক ডিজিজেজ রিসার্চ গ্রুপ, সেন্টার ফর কমিউনিকেবল ডিজিজেজ, আইসিডিডিআর,বি

অর্থানুকূল্য: সেন্টারস ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশন, আটলান্টা, যুক্তরাষ্ট্র

মন্তব্য

বাংলাদেশে এভিয়েন ইনফ্লুয়েঞ্জা এইচ৫এন১ ভাইরাসে হাঁস-মুরগি আক্রান্ত হওয়ার প্রথম খবর প্রকাশিত হওয়ার চারবছর পর গ্রামাঞ্চলের বাড়ির আঙ্গিনায় হাঁস-মুরগি পালনকারীদের অর্ধেকেরও বেশি (যাদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়) জানিয়েছেন যে, তারা এভিয়েন ইনফ্লুয়েঞ্জা অথবা বার্ড ফ্লু সম্পর্কে কোনোকিছু শোনেন নি এবং মানুষের মধ্যে এভিয়েন ইনফ্লুয়েঞ্জার সংক্রমণ প্রতিরোধের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক সুপারিশকৃত ১০টি সতর্কতামূলক ব্যবস্থা তারা নিয়মিতভাবে অনুসরণ করেন নি।

তবে, বার্ড ফ্লু সম্পর্কে যারা জানতেন এবং যারা অজ্ঞ ছিলেন তাদের মধ্যে হাঁস-মুরগি পালনসংক্রান্ত অভ্যাসের মধ্যে পরিলক্ষিত উল্লেখয্যোগ্য পার্থক্য থেকে ধারণা করা যায় যে, উত্তরদাতাদের মধ্যে যারা সতর্কতামূলক ব্যবস্থাগুলো সম্পর্কে জানতে পেরেছিলেন তারা হয়তো হাঁস-মুরগি পালনের ক্ষেত্রে কিছু অভ্যাস পরিবর্তন করেছিলেন।

চিত্র ২: এভিয়েন ইনফ্লুয়েঞ্জা অথবা বার্ড ফ্লু সম্পর্কে যারা শুনেছেন এবং শোনেন নি তাদের সরকার কর্তৃক সুপারিশকৃত সংক্রমণ-প্রতিরোধী সতর্কতামূলক ব্যবস্থাগুলো অনুসরণ করার শতকরা হার (গবেষণাকাল ২০০৯ থেকে ২০১১)

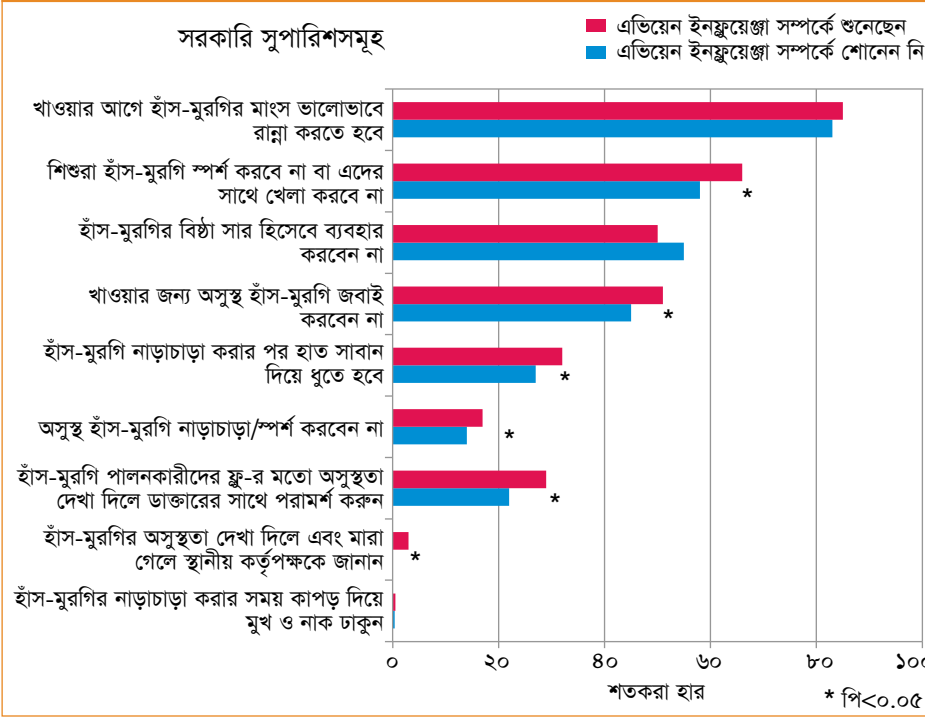

বাংলাদেশে হাঁস-মুরগি পালনকারীদের মধ্যে কেন এভিয়েন ইনফ্লুয়েঞ্জাসংক্রান্ত জ্ঞান কম এবং মানুষের মধ্যে এভিয়েন ইনফ্লুয়েঞ্জার সংক্রমণ প্রতিরোধের লক্ষ্যে সুপারিশকৃত ব্যবস্থা থেকে তাদের বর্তমান অভ্যাস কেন ভিন্ন তা কয়েকটি বিষয়ের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। উত্তরদাতাদের অর্ধেকের বেশি কখনো এভিয়েন ইনফ্লুয়েঞ্জা বা বার্ড ফ্লু সম্পর্কে কোনো তথ্য জানতেন না, কারণ সম্ভবত তাদের রেডিও ও টেলিভিশন ছিলো না অথবা তাদের রেডিও শোনা বা টেলিভিশন দেখার সুযোগ ছিলো না। ফলে ওইসব মাধ্যমে প্রচারিত সরকারি বার্তাসমূহ সম্ভবত তাদের কাছে পৌঁছায় নি। এক-তৃতীয়াংশের বেশি অংশগ্রহণকারীদের কোনো আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ছিলো না, আর তাই তাদের পক্ষে কাগজে ছাপানো বার্তা পড়া সম্ভব ছিলো না। তাছাড়া, অংশগ্রহণকারীদের প্রায় সবাই ছিলেন মহিলা যাদের বাড়িতে অথবা অন্যত্র গিয়ে খবরের কাগজ পড়া বা টেলিভিশন দেখার সুযোগ খুব কম ছিলো (১২,১৩)।

হাঁস-মুরগি পালনকারী মুখ্য ব্যক্তিদের দুই-তৃতীয়াংশ অসুস্থ হাঁস-মুরগি নাড়াচাড়া করেছেন। বাংলাদেশে যেহেতু মানুষের মধ্যে খুব কমই এভিয়েন ইনফ্লুয়েঞ্জা-আক্রান্ত রোগী সনাক্ত করা হয়েছে এবং এদের মধ্যে কেউই মারা যায় নি, সম্ভবত তাই হাঁস-মুরগি পালনকারীদের ধারণা, অসুস্থ হাঁস-মুরগি নাড়াচাড়া করলে এ-রোগে সংক্রামিত হওয়ার সম্ভাবনা খুব কম। হাঁস-মুরগি মরে যেতে পারে এটা বুঝতে পেরে খানাসমূহের (উত্তরদাতাদের) অর্ধেক তাদের বিনিয়োগের কিছুটা পুষিয়ে নেওয়ার জন্য অসুস্থ হাঁস-মুরগি জবাই করে খেয়েছেন (১৪)।

বাড়ির আঙ্গিনায় হাঁস-মুরগি পালনকারীদের সবার পক্ষে সম্ভবত সুপারিশকৃত পূর্বসতর্কতার কিছুকিছু বাস্তবায়ন করা সম্ভব ছিলো না। উদাহরণস্বরূপ, একটি বার্তায় বলা হয়েছে: "হাঁস-মুরগি, বিশেষ করে মুরগির ছানা নাড়াচাড়া করার সময় মুখোশ পরুন অথবা মোটা কাপড় দিয়ে নাক ও মুখ ঢাকুন"; কিন্তু হাঁস-মুরগি পালনকারীদের পক্ষে হাঁস-মুরগি নাড়াচাড়া করা বা ধরার প্রতিটি সময় আলাদাভাবে চিহ্নিত করা কষ্টকর, কারণ বাড়ির আঙ্গিনায় পালিত হাঁস-মুরগি বাড়ির ভেতরে এবং আসেপাশে স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়ায়। অধিকন্তু, বাংলাদেশের আবহাওয়ায় গ্রীষ্মকালে যেধরনের গরম (৩২°-৩৮° সেলসিয়াস) এবং আর্দ্রতা থাকে (জুন থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ৮০% আর্দ্রতা) তাতে হাঁস-মুরগি নাড়াচাড়া করার সময় নাকমুখ ঢেকে রাখা কষ্টসাধ্য (১৫,১৬)। এক্ষেত্রে আরো একটি বড় প্রতিবন্ধকতা হতে পারে: অধিকাংশ মানুষের মুখোশ নেই অথবা কোথায় এটি পাওয়া যায় তা তারা জানেন না। আরেকটি বার্তায় বলা হয়েছে: "হাঁস-মুরগি/পাখির অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনা স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে জানান"; কিন্তু হাঁস-মুরগি পালনকারীদের জানা প্রয়োজন কে সেই স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এবং কীভাবে তাদের সাথে যোগাযোগ করতে হবে। সম্ভবত এসংক্রান্ত তথ্যের অভাবের কারণে অতীতে হাঁস-মুরগির মৃত্যুর খবর কম জানা গেছে।

প্রতিরোধক বার্তাসমূহ হওয়া উচিত সম্পূর্ণ ও সংক্ষিপ্ত এবং অসুস্থ হাঁস-মুরগি জবাই করা ও মাংস কেটে টুকরো করাসম্পর্কিত। সংশোধিত বার্তাসমূহে মানুষ এবং হাঁস-মুরগি বার্ড ফ্লুতে আক্রান্ত হলে তাদের শরীরে কী ধরনের সুনির্দিষ্ট চিহ্ন ও লক্ষণ দেখতে পাওয়া যায়, হাঁস-মুরগি থেকে হাঁস-মুরগিতে এবং হাঁস-মুরগি থেকে মানুষের মধ্যে ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস কীভাবে ছড়ায়, সেসব উল্লেখপূর্বক জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে এসব তথ্যের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করা যেতে পারে যা হাঁস-মুরগি পালনকারীদের এই রোগ সম্পর্কে আরো ভালোভাবে বুঝতে সাহায়তা করবে এবং তাদের এলাকায় মানুষ এবং হাঁস-মুরগির মধ্যে এই রোগ ছড়ানোর ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করবে। বাংলাদেশে বাড়ির আঙ্গিনায় হাঁস-মুরগি পালনের লক্ষ্যে রোগ-প্রতিরোধক ব্যবস্থা অনুসরণ করা যেতে পারে, যা হাঁস-মুরগির স্বাস্থ্য এবং লাভজনকভাবে বাড়িতে হাঁস-মুরগি পালনে সহায়ক হবে (১৪)। হাঁস-মুরগির অস্বাভাবিক মৃত্যুসংক্রান্ত তথ্য কীভাবে যথাযথ স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে জানাতে হবে সুপারিশকৃত বার্তায় তার ব্যাখ্যা থাকা প্রয়োজন, সেইসাথে সম্ভব হলে তথ্য জানাতে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে তথ্য প্রদানকারীর জন্য কিছু আর্থিক সুবিধার ব্যবস্থাও করা যেতে পারে। সবশেষে, যেহেতু বেশিরভাগ হাঁস-মুরগি পালনকারীর রেডিও শোনা ও টেলিভিশন দেখা এবং পত্র-পত্রিকা পড়ার সুযোগ সীমিত, তাই সর্বোত্তম যোগাযোগের মাধ্যম চিহ্নিত করে বার্তাসমূহ প্রচার করতে হবে। এই প্রচারাভিযানে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক, সামাজিক স্বাস্থ্যকর্মী এবং/অথবা গ্রামীণ এলাকায় কর্মরত বেসরকারি সংস্থার কর্মচারীদেরকে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে তাদের শুধুমাত্র লিফলেট অথবা পোস্টার বিরতণ করলেই চলবে না, অভীষ্ট জনগোষ্ঠির কাছে প্রতিরোধক বার্তাসমূহ সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যাও করতে হবে।

References

1. Dolberg F. Poultry sector country review: Bangladesh. Rome: FAO Animal Production and Health Division, 2008. 61 p.
2. Biswas PK, Christensen JP, Ahmed SSU, Barua H, Das A, Das A *et al*. Avian influenza outbreaks in chickens, Bangladesh. *Emerg Infec Dis* 2008;14:1909-12.
3. Wolfe ND, Dunavan CP, Diamond J. Origins of major human infectious diseases. *Nature* 2007;447:279-83.

4. World Organization of Animal Health. Terrestrial animal health code, 6th edi. Paris: World Organization of Animal Health, 2007.
5. Rabinowitz P, Perdue M, Mumford E. Contact variables for exposure to Avian influenza H5N1 virus at the human-animal interface. *Zoonoses Public Health* 2010;57:227-38.
6. Brooks WA, Alamgir ASM, Sultana R, Islam MS, Rahman M, Fry AM, *et al*. Avian influenza virus A (H5N1), detected through routine surveillance in child, Bangladesh. *Emerg Infec Dis* 2009;15:1311-3.
7. icddr,b. Outbreak of mild respiratory disease caused by H5N1 and H9N2 infections among young children in Dhaka, Bangladesh. *Health Sci Bul* 2011;9:5-12.
8. Institute of Epidemiology, Disease Control & Research. Fourth H5N1 human case in Bangladesh. Dhaka: Institute of Epidemiology, Disease Control & Research, 2012. (http://www.iedcr.org/images/pdf/Fourth-H5N1-human-case-in-Bangladesh.pdf, accessed on 03 March 2012.)
9. Institute of Epidemiology, Disease Control & Research. Fifth and Sixth H5N1 human case in Bangladesh. Dhaka: Institute of Epidemiology, Disease Control & Research, 2012. (http://www.iedcr.org/images/pdf/Web%20 Notification%20H5N1%20050312.pdf, accessed on 03 March 2012.)
10. World Health Organization. Cumulative number of confirmed human cases of avian influenza A(H5N1) reported to WHO, 06 July, 2012. Geneva: World Health Organization, 2012. (http://www.who.int/influenza/human_animal_interface/H5N1_cumulative_table_archives/en/index.html, accessed on 07 July 2012)
11. United Nations Children's Fund. Bird Flu: What you need to know. New York, NY: United Nations Children's Fund, 2007. (http://www.influenzaresources.org/index_768.html, accessed on 12 January 2012).
12. icddr,b. Reaching women and girls: Experiences of a national HIV prevention programme in Bangladesh. *Health Sci Bul* 2009;7:9-16.
13. Westoff C, Charles F, Dawn A, Koffman, Caroline M. The impact of television and radio on reproductive behavior and on HIV/AIDS knowledge and behavior. DHS Analytical Studies No. 24. Maryland: ICF International, 2011.
14. Sultana R, Rimi NA, Azad S, Islam MS, Khan MS, Gurley ES *et al*. Bangladeshi backyard poultry raisers' perceptions and practices related to zoonotic transmission of avian influenza. *J Infect Dev Ctries* 2012;6:156-65.
15. Geography of Bangladesh. (http://lcweb2.loc.gov/frd/cs/bdtoc.html, accessed on 27 March 2012).
16. Banglapedia. National Encyclopedia of Bangladesh. (http://www.banglapedia.org/httpdocs/HT/C_0288.HTM, accessed on 05 January 2012.
17. Climate of Bangladesh. (http://ancienthistory.about.com/od/atlas/qt/climateBangla.htm, accessed on 14 January 2012).

বাংলাদেশে হাসপাতালের ভৌত-পরিবেশ থেকে সংক্রমণের ঝুঁকি এবং তা নিয়ন্ত্রণের উপায়

সংক্রমণের ঝুঁকি এবং নিয়ন্ত্রণের সুযোগসমূহ সম্পর্কে ধারণা পাওয়ার জন্য এই প্রতিবেদনে বাংলাদেশের তৃতীয় স্তরের (টারশিয়ারি) তিনটি হাসপাতালের ভৌত-পরিবেশের বর্ণনা করা হয়েছে। আমরা ছয়টি ওয়ার্ডের অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা ও বিভিন্ন অংশ বর্ণনা করে মানচিত্র তৈরি করেছি এবং ৪৮ ঘণ্টা সেসব ওয়ার্ডের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করেছি। ওয়ার্ডগুলোর প্রতি ১০০ বর্গফুট জায়গায় মানুষের উপস্থিতির মধ্যমা সংখ্যা ছিলো চার এবং প্রতিঘণ্টায় প্রতি ১০০ বর্গফুট জায়গায় নাকমুখ না-ঢেকে গড়ে পাঁচটি কাশি ও হাঁচি দেওয়ার ঘটনা পরিলক্ষিত হয়েছে। মানুষের দেহনিঃসৃত তরল পদার্থে প্রায়ই ওয়ার্ডের মেঝে নোংরা হতে দেখা গেছে। ২৮টি হাত-ধোয়ার স্থানের মধ্যে সাতটিতে পানির সরবরাহ এবং সাবান ছিলো। জীবাণুমুক্ত না-করেই চিকিৎসা সরঞ্জামাদি ব্যবহার করা হয়েছে। অপর্যাপ্ত অবকাঠামো এবং অপ্রতুল পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম সংক্রমণ ছড়ানোর অনেক সুযোগ সৃষ্টি করে। সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমগুলোতে হাসপাতালের মৌলিক অবকাঠামো নিশ্চিতকরণের ওপর গুরুত্ব দেওয়া উচিত।

নিম্ন-আয়ের দেশসমূহে হাসপাতাল থেকে রোগসংক্রমণ জনস্বাস্থ্যের জন্য একটি বড় উদ্বেগের কারণ (১)। বায়ুবাহিত দূষিত কণা (এয়ারবর্ন পার্টিকলস), হাঁচি-কাশির মাধ্যমে বাতাসে ছড়ানো জীবাণু (রেসপিরেটরি ড্রপলেট) অথবা দেহনিঃসৃত সংক্রামক তরল পদার্থের সাথে সরাসরি সংস্পর্শের মাধ্যমে হাসপাতালের পরিবেশ সংক্রামিত হওয়ার ঝুঁকির মধ্যে থাকে (২-৪)। হাসপাতালের মেঝে, বায়ু, শৌচাগার ও হাত-ধোয়ার স্থান, চিকিৎসা সরঞ্জাম এবং হাসপাতাল-বর্জ্যসহ হাসপাতালের বিভিন্ন উপাদান সেখানকার সংক্রামক জীবাণুর সম্ভাব্য উৎস হতে পারে (৩,৫)। এসব সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি নির্দিষ্ট মানের মৌলিক অবকাঠামোবিশিষ্ট হাসপাতালের জন্য আন্তর্জাতিক সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ নির্দেশিকা প্রণয়ন করা হয়েছে (২,৪), তবে নিম্ন-আয়ের দেশসমূহের হাসপাতালে সেই ধরনের মৌলিক অবকাঠামো নাও থাকতে পারে। এই প্রতিবেদনে সংক্রমণের ঝুঁকি এবং সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণের সুযোগসমূহ সম্পর্কে ধারণা লাভের জন্য তিনটি হাসপাতালের নির্বাচিত ওয়ার্ডের ভৌত অবকাঠামো এবং ওয়ার্ডসমূহের পরিবেশ দূষণ বর্ণনা করা হয়েছে।

২০০৭ সালের মার্চ থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আমরা তিনটি জেলায় শিক্ষাদানে নিয়োজিত তৃতীয় স্তরের তিনটি সরকারি হাসপাতালের প্রতিটি থেকে একটি শিশু-ওয়ার্ড ও একটি বয়স্ক পুরুষ-ওয়ার্ডের তথ্য সংগ্রহ করেছি (হাসপাতাল এ, বি ও সি)। আমরা প্রতিটি ওয়ার্ডের অবকাঠামোগত নকশার বর্ণনা এবং ওয়ার্ডের আয়তন পরিমাপের জন্য সেগুলোর মানচিত্র তৈরি করি। পরবর্তীকালে আমরা ছয়টি ওয়ার্ডের প্রতিটিতে তিন থেকে চারটি সেশন পর্যবেক্ষণ করি যেখানে প্রতিটি পর্যবেক্ষণের স্থায়িত্বকাল ছিলো এক থেকে তিন ঘণ্টা। এভাবে আমরা ২২টি সেশনে মোট ৪৮ ঘণ্টা পর্যবেক্ষণ করি। একটি দিনের বিভিন্ন সময়ে কাজের ভিন্নতা পর্যবেক্ষণ করার জন্য সকাল থেকে রাত পর্যন্ত তিনটি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে সেশনসমূহ অনুষ্ঠিত হয়। যেহেতু নতুন রোগী ভর্তির জন্য হাসপাতাল সি-তে সপ্তাহের দুটি দিন নির্দিষ্ট ছিলো এবং অন্য দুটি হাসপাতালে প্রতিদিনই রোগী ভর্তি করা হতো, হাসপাতাল সি-এর রোগী ভর্তির দিনে প্রতিটি ওয়ার্ডে আমরা অতিরিক্ত তিনঘণ্টা পর্যবেক্ষণ করি। আমরা ওয়ার্ডের লোকসংখ্যা, রোগীদের দেহনিঃসৃত তরল পদার্থ ও মলমুত্রের মাধ্যমে ওয়ার্ডের পরিবেশ দূষণ, চিকিৎসা-সরঞ্জাম এবং

ব্যক্তিগত সুরক্ষা-সরঞ্জামের ব্যবহার, হাত ধোয়া ও মলমূত্রত্যাগসংক্রান্ত অভ্যাস, ওয়ার্ডে পশুর উপস্থিতি এবং বর্জ্য অপসারণসংক্রান্ত অভ্যাস লিপিবদ্ধ করি। রোগী, শুশ্রূষাকারী, স্বাস্থ্যসেবাদানকারীদের হাত রোগীর দেহনিঃসৃত তরল পদার্থ এবং মলমুত্র দ্বারা দূষিত হলে অথবা কোনো একটি ঘটনার আগে অথবা পরে তাদের হাত ধোয়ার প্রয়োজন হলে (যেমন হাঁচি-কাশি দেওয়ার সময় হাত দিয়ে মুখ ঢাকার পরে, রোগীকে সেবা দেওয়ার আগে অথবা পরে এবং খাওয়ার আগে) তারা হাত ধুয়েছেন কি না তা লিপিবদ্ধ করি।

প্রতিটি হাসপাতালের ওয়ার্ডগুলো হয় খোলা ছিলো কিংবা চারফুট উচু দেওয়াল দিয়ে ছোট ছোট কক্ষে বিভক্ত ছিলো এবং তাছাড়া অবাধ বায়ু-প্রবাহের জন্য সিলিং ফ্যান, বারান্দা ও জানালা এবং/অথবা প্রতিটি কক্ষের বিপরীত দিকে দরজা ছিলো। স্বাস্থ্যসেবাদানকারীদের জন্য নির্দিষ্ট ১৬টি হাত-ধোয়ার স্থানের মধ্যে শুধুমাত্র সাতটিতে সাবান ছিলো এবং সেগুলোর অধিকাংশই শুধুমাত্র জ্যেষ্ঠ ডাক্তারদের জন্য সংরক্ষিত ছিলো। রোগীদের জন্য নির্ধারিত ১২টি হাত-ধোয়ার স্থানের মধ্যে মাত্র দুটিতে পানির সরবরাহ ছিলো (সারণি ১) এবং সেগুলোর মধ্যে কোনোটিতেই সাবান ছিলো না। হাত-ধোয়ার ২,৭০৯টি সুযোগের মধ্যে আমরা শুধুমাত্র ৩২টি (১.২%) ক্ষেত্রে সাবান দিয়ে হাত ধোয়া লক্ষ্য করেছি।

সারণি ১: তিনটি হাসপাতালের ছয়টি ওয়ার্ডের বৈশিষ্ট্যসমূহ, ২০০৭

ওয়ার্ডের কাঠামো		হাসপাতাল এ		হাসপাতাল বি		হাসপাতাল সি	
		বয়স্ক	শিশু	বয়স্ক	শিশু	বয়স্ক	শিশু
সাধারণ রোগীদের জন্য জায়গা (বর্গফুট)*		৩,৪০৭	২,৫৯০	২,৮০০	১,০৮৩	২,২০২	১,৮৮০
বিছানার সংখ্যা		৩৫	৩১	৩০	১৫	৩০	৩৩
রোগীদের বিছানার মধ্যে গড় দূরত্ব (ফুট)		২.৫	২.৪	৩.৭	২.১	২.৫	১.৯
পায়খানার সংখ্যা	কর্মচারীদের জন্য	২	১	১	২	২	৮
	রোগী এবং দর্শনার্থীদের জন্য	৪	১	৪	২	৪	২
কার্যকর হাত-ধোয়ার স্থান	কর্মচারীদের জন্য	২	১	১	২	৪	৬
	রোগী এবং দর্শনার্থীদের জন্য	০	০	০	০	২	০

**ওয়ার্ডের মধ্যে রোগীদের বিছানা এবং নার্সিং স্টেশনও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে*

হাসপাতালের ওয়ার্ডগুলো ছিলো জনাকীর্ণ, যেখানে ১০০ বর্গফুট জায়গায় রোগী, শুশ্রূষাকারী, দর্শনার্থী এবং স্বাস্থ্যসেবাদানকারীসহ সার্বিকভাবে মানুষের উপস্থিতির মধ্যমা সংখ্যা ছিলো ৩.৬ (৯৫% কনফিডেন্স ইন্টারভ্যাল [সিআই]: ২.৩-৪.৩)। হাসপাতাল বি এবং সি-এর ওয়ার্ডসমূহে রোগীর ধারণক্ষমতার তুলনায় গড়ে ১.২ গুণ বেশি রোগী ভর্তি ছিলো। পক্ষান্তরে হাসপাতাল এ-তে রোগী এবং বিছানার অনুপাত ছিলো আনুমানিক ০.৭। যখন বিছানা অপ্রতুল ছিলো তখন রোগীদের বিছানার সামনে অথবা দুটি বিছানার মাঝখানে অথবা বারান্দার মেঝেতে কম্বল অথবা তোষক বিছিয়ে রোগীদেরকে চিকিৎসাসেবা দেওয়া হতো। বয়স্ক রোগীদের ওয়ার্ডের তুলনায় শিশু রোগীদের ওয়ার্ড অধিক জনাকীর্ণ ছিলো (চিত্র ১)। হাসপাতাল বি এবং সি-এর শিশুদের ওয়ার্ডে কোনো কোনো ক্ষেত্রে আমরা ২-৩ জন রোগীকে একটি বিছানা ভাগাভাগি করে ব্যবহার করতে দেখেছি। পরের পৃষ্ঠায় পর্যবেক্ষণ নোট থেকে হাসপাতাল সি-এর শিশু-ওয়ার্ডে রোগী ভর্তি করার একটি দিনের বর্ণনা তুলে ধরা হলো:

ওয়ার্ডটি জনাকীর্ণ হয়ে গিয়েছিলো, এমনকি বারান্দাও রোগী এবং তাদের শুশ্রূষাকারীদের দিয়ে পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছিলো। কিছুকিছু রোগীর মায়ের সাথে আরেকটি সুস্থ শিশু তাদের সাথে ওয়ার্ডে অবস্থান করছিলো। শুশ্রূষাকারীরা তাদের রোগীদের নিয়ে নার্সিং স্টেশনে জড়ো হয়েছিলো। ডাক্তার এবং নার্সগণ রোগী পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার বিছানায় এবং নার্সিং টেবিলে একই সাথে ২-৩ জন রোগীকে দ্রুততার সাথে পরীক্ষা করেন, ওষুধ দেন, ইনজেকশন অথবা নেবুলাইজার দেন, ক্যানুলা প্রবেশ করান অথবা খুলে ফেলেন এবং রক্ত সংগ্রহ করেন।

চিত্র ১: ২০০৭ সালে তিনটি হাসপাতালের ওয়ার্ডভিত্তিক প্রতি ১০০ বর্গফুট এলকায় উপস্থিত সেবাদানকারী, রোগী, শুশ্রূষাকারী এবং দর্শণার্থীদের মধ্যমা সংখ্যা

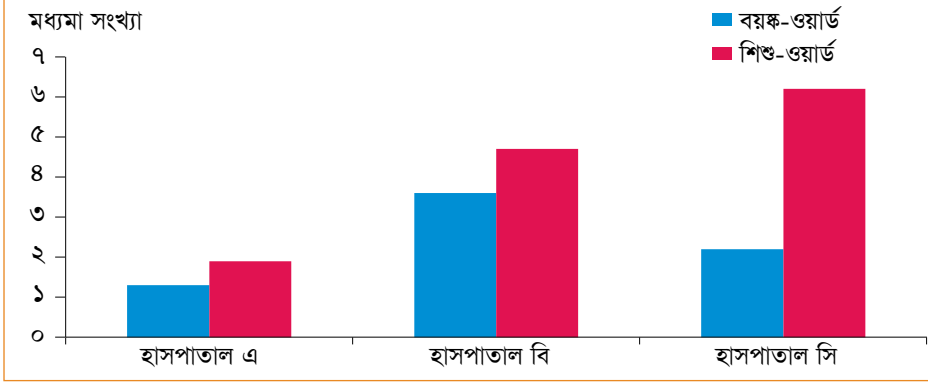

যদিও গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত হাসপাতালসমূহে রোগীদের সাথে সাক্ষাতের জন্য সময় নির্ধারিত ছিলো, যেকোনো সময়ই ওয়ার্ডের ভিতরে দর্শনার্থীদেরকে ঢুকতে দেখা গেছে। হাসপাতাল এ এবং সি-এ চা, পানি অথবা হালাকা খাবার বিক্রির জন্য ফেরিওয়ালাদেরকে একটি ওয়ার্ড থেকে অন্য ওয়ার্ডে ঘুরে বেড়াতে দেখা গেছে। একজন নাপিত বয়স্কদের একটি ওয়ার্ডে রোগীরা চুল কাটাবেন কি না তা জানতে চাচ্ছিলেন।

প্রতিঘণ্টায় প্রতি ১০০ বর্গফুট এলাকায় নাকমুখ না-ঢেকে কাশি অথবা হাঁচি দেওয়ার মধ্যমা সংখ্যা ছিলো পাঁচ (৯৫% সিআই: ৪-৬)। শুশ্রূষাকারী এবং হাসপাতাল কর্মচারীরা রোগীদের সেবা দেওয়ার সময় কাশি এবং হাঁচি দিয়েছেন। এসব কাশি এবং হাঁচির মাত্র ১% দেওয়া হয়েছে নাকমুখ ঢেকে এবং কাশি অথবা হাঁচি দেওয়ার পর কাউকেই হাত ধুতে দেখা যায় নি।

ওয়ার্ডের মেঝে, দেওয়াল, জানালা এবং বারান্দার গ্রিল, রোগীর বিছানার রেলিং, নার্সিং টেবিলের উপরিভাগ, বিছানার চাদর, তোশক এবং কম্বল রোগী এবং পারিবারিক শুশ্রূষাকারীদের দেহনিঃসৃত তরল পদার্থ এবং মলমুত্র দ্বারা নোংরা ছিলো। নিম্নে বয়স্কদের একটি ওয়ার্ড পর্যবেক্ষণের একটি বর্ণনা দেওয়া হলো:

একজন ডাক্তার যখন একজন রোগীকে রক্ত দিতে যাচ্ছিলেন তখন দুর্ঘটনাক্রমে রক্তের ফোঁটা রোগীর বিছানায় এবং মেঝেতে পড়ে। পারিবারিক শুশ্রূষাকারী এক টুকরা কাগজ দিয়ে রক্ত মুছে ফেলেন কিন্তু রক্তের দাগ দৃশ্যমান রয়ে যায় এবং পর্যবেক্ষণ চলাকালীন সময়ে কেউই সেটা পরিষ্কার করেন নি। মেঝে থেকে রক্ত মোছার সময় শুশ্রূষাকারী তার হাতের তালুর উল্টা পিঠ দিয়ে তার নাক মুছেন।

পরিচ্ছন্নতাকর্মীরা প্রতিদিন শুকনা ঝাড়ু দিয়ে ওয়ার্ডের মেঝে ঝাট দিতো। আমরা কখনোই জানালা, বিছানার রেলিং, কেবিনেট অথবা দেওয়াল পরিষ্কার করতে দেখি নি। রোগী এবং দর্শনার্থীদের

শৌচাগার ছিলো ভেজা, পিচ্ছিল এবং দেহনিঃসৃত তরল পদার্থ, মল এবং খাবারের উচ্ছিষ্টাংশ দ্বারা নোংরা। চিকিৎসা-সরঞ্জামাদি, যেমন, নেবুলাইজার, অক্সিজেন টিউব, স্ট্যাথোসকোপ এবং রক্তচাপ মাপার যন্ত্রের কাফ ব্যবহারের আগে অথবা পরে সংক্রমণমুক্ত করতে দেখা যায় নি।

সাময়িকভাবে বর্জ্য (ব্যবহৃত চিকিৎসাসংক্রান্ত জিনিসপত্র, যেমন ধারালো বস্তু, রোগীর দেহনিঃসৃত তরল পদার্থ এবং খাবারের উচ্ছিষ্ট এবং অন্যান্য আবর্জনা) রাখার জন্য রোগীর বিছানার নিচে খোলা গামলা অথবা বালতি ছিলো। পরিচ্ছন্নতাকর্মীরা দিনে একবার সেসব গামলা অথবা বালতি থেকে আবর্জনাগুলো বড় বালতি অথবা ড্রামে ঢেলে নিয়ে হাসপাতাল সংলগ্ন জায়গায় ফেলে দিতো। সবগুলো ওয়ার্ডেই ফেলে দেওয়া আবর্জনা ঘেঁটে খাবার খোঁজাখুঁজি করতে বিড়াল দেখা গেছে এবং রোগীদের বিছানার ওপরও বিড়াল উঠতে দেখা গেছে। ওয়ার্ডগুলোর ভেতরে আমরা ছুঁচো, আরশোলা, মাছি এবং মশাও লক্ষ করেছি। রাতে হাসপাতাল এ এবং সি-তে রোগীরা মশারি ব্যবহার করতো, কিন্তু হাসপাতাল বি-তে নয়। আমরা প্রতিটি হাসপাতালের চত্বরে কুকুর এবং গবাদিপশু বিচরণ করতে দেখেছি।

প্রতিবেদক: সেন্টার ফর কমিউনিকেবল ডিজিজেজ, আইসিডিডিআর,বি

অর্থানুকূল্য: সেন্টারস ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশন (সিডিসি), যুক্তরাষ্ট্র

মন্তব্য

জনসংখ্যার আধিক্য, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতাসংক্রান্ত অপর্যাপ্ত সুবিধা এবং নিয়মিত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন না-করা, সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণের জন্য মৌলিক ব্যবস্থাপনা (যেমন কাশি দেওয়ার নিয়ম, ব্যবহারের আগে ও পরে চিকিৎসা-সরঞ্জামাদি সংক্রমণমুক্ত করা) এবং সার্বিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনার অভাব সম্মিলিতভাবে পর্যবেক্ষণকৃত হাসপাতালসমূহের ওয়ার্ডে সংক্রমণ ছড়ানোর প্রভূত সুযোগ সৃষ্টি করেছে। এই ধরনের পরিবেশ, বিশেষকরে সংক্রামিত হাত, চিকিৎসা-সরঞ্জামাদি অথবা মেঝের সংস্পর্শে আসার মাধ্যমে রোগী, পারিবারিক শুশ্রূষাকারী, দর্শনার্থী এবং হাসপাতালের কর্মচারীসহ ওয়ার্ডে অবস্থিত সকলের মধ্যে সংক্রমণ ছড়ানোর হুমকি সৃষ্টি করে।

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত ওয়ার্ডসমূহে মাত্রাতিরিক্ত রোগী ও শুশ্রূষাকারীদের উপস্থিতির ফলে রোগীদের জন্য প্রয়োজনীয় জায়গা কমে যায় এবং উপস্থিত সবাই একে অপরের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে চলে আসে। হাসপাতালের জনাকীর্ণ পরিবেশ অনেক রোগ ছড়ানোর ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে বলে মনে হয় (৬,৭)। বাংলাদেশের তৃতীয় স্তরের একটি হাসপাতালের সার্জিকেল ওয়ার্ডের বিভিন্ন শ্রেণীপেশার রোগীদের মধ্যে পরিচালিত একটি গবেষণায় দেখা গেছে যে, হাসপাতালে ভর্তির পর রোগে আক্রান্ত (নসোকোমিয়াল) হওয়ার সাথে অধিকসংখ্যক দর্শনার্থীর আগমনের (প্রতিদিন একজন রোগীর বিপরীতে গড়ে পাঁচজন দর্শনার্থী) সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে (৮)। ওয়ার্ডে অন্য রোগীর সাথে বিছানা ভাগাভাগি করে ব্যবহার করার ফলেও একজনের কাছ থেকে অন্যজনের মধ্যে সহজেই রোগ ছড়াতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, একটি গবেষণা থেকে জানা যায় যে, একজন নিপা ভাইরাস-আক্রান্ত রোগীর সাথে বিছানা ভাগাভাগি করে ব্যবহার করার ফলে রোগীর শুশ্রূষাকারীও নিপা এনসেফালাইটিস রোগে আক্রান্ত হন (৫)। কাশি, হাঁচি অথবা অপর্যাপ্ত বায়ু সঞ্চালন ব্যবস্থার ফলে বাতাস অথবা ড্রপলেটের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের রোগ, যেমন শ্বাসতন্ত্রের মারাত্মক সংক্রমণ, নিপা, যক্ষ্মা, হাম, ইনফ্লুয়েঞ্জা, জলবসন্ত, মেনিনজাইটিস, মাম্পস এবং অ্যাসপারজিলোসিস ছড়াতে পারে (২,৩)।

হাসপাতালের পরিবেশ, যেমন মেঝে, দেওয়াল, জানালার গ্রিল, রোগীর বিছানার রেলিং, সেবাপ্রদানে

ব্যবহৃত টেবিলের উপরিভাগ এবং পোষাক-পরিচ্ছদ নসোকোমিয়াল প্রক্রিয়ায় বিস্তারযোগ্য জীবাণুর সম্ভাব্য আধার হতে পারে। জীবাণুগুলো ওইসব স্থানে সপ্তাহের পর সপ্তাহ অথবা মাসের পর মাস বেঁচে থাকতে পারে এবং সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটাতে পারে (৩)। সম্ভাব্য দূষিত শৌচাগারের মেঝে, পানির কল, দরজার হাতল, পানির পাত্র এবং দেয়ালসমূহ কলেরা (৯), হেপাটাইটিস এ (১০), ভেনকোমাইসিন-প্রতিরোধী এন্টারোকক্কাই (১১) এবং সন্তান প্রসবজনিত (পিউরপেরাল) জ্বরসহ (১২) নানা প্রকার রোগ-জীবাণুর বংশবিস্তার এবং সংক্রমণের সম্ভাব্য উৎসস্থল হতে পারে। যেসব চিকিৎসা-সরঞ্জাম জীবাণুমুক্ত না-করেই রোগীদের জন্য পুনরায় ব্যবহার করা হয় সেগুলো বিভিন্ন ধরনের জীবাণুর (গ্রাম-নেগেটিভ ব্যাসিলাই, কোয়াগুলেস-নেগেটিভ স্টেফাইলোকক্কাই, ম্যাথিসিলিন-রেজিস্ট্যান্ট *স্টেফলোকক্কাস অরিয়াস*) ফোমাইট (জীবাণুদ্বারা দূষিত দ্রব্যাদি যা রোগ ছড়াতে সহায়ক) হিসেবে কাজ করতে পারে। নিয়মিত পরিষ্কার না-করা এবং ঘনঘন নোংরা দেওয়াল, মেঝে ইত্যাদির সংস্পর্শে আসার ফলে জীবাণু সংক্রমণের সম্ভাবনা বেড়ে যায়, যেমনটি এই গবেষণার সাথে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডসমূহে দেখা গেছে। হাসপাতালের অধিকাংশ সংক্রমণ ঘটে থাকে সরাসরি সংস্পর্শের মাধ্যমে (৩) এবং হাতের স্পর্শ হলো রোগ বিস্তারের প্রধান মাধ্যম (১৩)। আর তাই সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে হাত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা এককভাবে সবচাইতে কার্যকর ব্যবস্থা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এই গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত ওয়ার্ডসমূহে সাবান দিয়ে হাত-ধোয়ার ঘটনা এত কম হওয়ার একটি কারণ হলো: কার্যকর এবং সহজে ব্যবহার করা যায় এমন হাত-ধোয়ার জায়গার অভাব। অন্যান্য গবেষণায় দেখা গেছে যে, সুবিধাজনক জায়গায় অধিক পরিমাণে হাত-ধোয়ার স্থানের ব্যবস্থা করার ফলে হাত-ধোয়াসংক্রান্ত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বৃদ্ধি পেয়েছে (১৪)।

আমাদের গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত হাসপাতালের ওয়ার্ডসমূহে যে অনিরাপদ বর্জ্য অপসারণ ব্যবস্থা দেখা গেছে তা বিশ্বব্যাপী (১৫) এবং বাংলাদেশে জনস্বাস্থ্যের জন্য উদ্বেগের কারণ, বিশেষ করে, অনিরাপদ প্রক্রিয়ায় চিকিৎসা সরঞ্জামসমূহ পুনরায় প্যাকেটে ভরা এবং দূষিত সরঞ্জামসমূহ পুনরায় ব্যবহার করা। ব্যবহৃত ধারালো সরঞ্জামসমূহ অন্যান্য বর্জ্যের সাথে একত্রে খোলা বালতিতে করে হাসপাতালের উন্মুক্ত চত্বরে ফেলে দেওয়ায় স্বাস্থ্যকর্মীরা পেশাগত ঝুঁকির মধ্যে পড়তে পারে এবং বর্জ্য অপসারণে নিয়োজিত কর্মী এবং ফেলে-দেওয়া বর্জ্য যারা বিক্রির জন্য সংগ্রহ করে তারা আঘাতপ্রাপ্ত হতে পারে এবং এর ফলে রোগ-সংক্রমণের সম্ভাবনাও বাড়তে পারে। ওয়ার্ডের ভেতরে এবং হাসপাতালের মাঠে পশুর বিচরণ পশু থেকে মানুষের মধ্যে রোগ ছড়ানোর হুমকি সৃষ্টি করতে পারে। ওয়ার্ডের ভেতরে যেসব কীটপতঙ্গ ছিলো সেগুলোও জীবাণুর বাহক হিসেবে রোগ ছড়াতে পারে (২)। বাংলাদেশে ডেঙ্গু রোগীরা প্রায়ই হাসপাতালে ভর্তি হয় (১৬) এবং হাসপাতালের ওয়ার্ডের ভেতরে অবস্থিত প্রচুর মশা ডেঙ্গু রোগীদের কাছ থেকে অন্যদের মধ্যে রোগ (নসোকোমিয়াল) ছড়ানোর সুযোগ সৃষ্টি করে।

এই গবেষণাটি শুধুমাত্র তিনটি তৃতীয় স্তরের সরকারি হাসপাতালে পরিচালিত হয় যেগুলো দৈবচয়নের ভিত্তিতে নির্বাচন করা হয় নি, আর তাই এই গবেষণার ফলাফল বাংলাদেশের তৃতীয় স্তরের অন্যান্য সরকারি হাসপাতাল অথবা বেসরকারি ক্লিনিক কিংবা অন্যান্য বেসরকারি হাসপাতাল যেগুলো জনাকীর্ণ নয় এবং সম্পদের সীমাবদ্ধতা নেই সেসব হাসপাতালের সাথে তুলনীয় নয়। যেহেতু তথ্য সংগ্রহে সম্পৃক্ত প্রত্যেক গবেষকের দায়িত্ব ছিলো একাধিক ব্যক্তির কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করা, সেজন্য কিছু ঘটনা পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব নাও হয়ে থাকতে পারে এবং আমাদের ধারণা, নিবন্ধে উল্লিখিত ঘটনার সংখ্যা প্রকৃত ঘটনার তুলনায় কম হয়ে থাকতে পারে। যেহেতু হাসপাতালের কর্মচারীরা এই গবেষণা কার্যক্রম এবং হাসপাতালে গবেষণা দলের উপস্থিতি সম্পর্কে অবগত ছিলেন, তাদের

সেবাদানসংক্রান্ত কার্যক্রমে এর প্রভাব পড়ে থাকতে পারে।

হাসপাতালের পরিবেশ দূষণের একাধিক কারণ এবং গবেষণায় অংশগ্রহকারী হাসপাতালসমূহ যেসব অসুবিধা মোকাবেলা করে তা এই গবেষণায় তুলে ধরা হয়েছে। আন্তর্জাতিক সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ নির্দেশিকার যেসব সুপারিশ উচ্চ-আয়ের দেশে বাস্তবায়ন করা সম্ভব তা সম্পদের অপ্রতুলতার কারণে এসব হাসপাতালে বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়। এই গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য ইন্টারভেনশন প্রণয়নে ব্যবহার করা যেতে পারে, যা সম্পদের অপ্রতুলতা আছে এমন পরিস্থিতিতে সর্বোচ্চ সেবাদানে এবং স্বাস্থ্যসেবাদানকারীদের ব্যক্তিগত সুরক্ষা বৃদ্ধিতে সহায়ক হতে পারে। সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমগুলোতে হাসপাতালের মৌলিক অবকাঠামো নিশ্চিতকরণের ওপর গুরুত্ব দেওয়া উচিত। ন্যূনতমসংখ্যক শৌচাগার এবং সাবানসহ কার্যকর হাত-ধোয়ার স্থান থাকতে হবে যেখানে হাসপাতালের কর্মচারী, রোগী, শুশ্রূষাকারী এবং দর্শনার্থীসহ সবার প্রবেশাধিকার এবং ব্যবহারের সুযোগ থাকে। ওয়ার্ডগুলোতে চিকিৎসাসংক্রান্ত বর্জ্য অপসারণের জন্য নির্দিষ্ট পাত্র এবং জৈব-ঝুঁকিপূর্ণ বর্জ্য পুড়িয়ে নষ্ট করার জন্য ইনসিনারেটার থাকা উচিত।

References

1. Allegranzi B, Nejad SB, Combescure C, Graafmans W, Attar H, Donaldson L *et al*. Burden of endemic health-care-associated infection in developing countries: systematic review and meta-analysis. *Lancet* 2010;377:228-41.
2. Sehulster L, Chinn RY. Guidelines for environmental infection control in health-care facilities. Recommendations of CDC and the Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee (HICPAC). *MMWR Recomm Rep* 2003;52:1-42.
3. Ulrich RS, Zimring CM, Zhu X; DuBose JR, Seo H, Choi YS *et al*. A review of the research literature on evidence-based healthcare design. *HERD* 2008;1:61-125.
4. World Health Organization. Prevention of hospital-acquired infections: A practical guide. Geneva: World Health Organization 2002.
5. Gurley ES, Montgomery JM, Hossain MJ, Bell M, Azad AK, Islam MR *et al*. Person-to-person transmission of Nipah virus in a Bangladeshi community. *Emerg Infect Dis* 2007;13:1031-7.
6. Clements A, Halton K, Graves N, Pettitt A, Morton A, Looke D *et al*. Overcrowding and understaffing in modern health-care systems: key determinants in meticillin-resistant Staphylococcus aureus transmission. *Lancet infect dis* 2008;8:427-34.
7. Harbarth S, Sudre P, Dharan S, Cadenas M, Pittet D. Outbreak of Enterobacter cloacae related to understaffing, overcrowding, and poor hygiene practices. *Infect Control Hosp Epidemiol* 1999;20:598-603.
8. Faruquzzaman. Positive associations of nosocomial infections in surgical ward with etiological clinical factors. *Bratisl Lek Listy* 2011;112:273-7.
9. Goh KT, Lam S, Ling MK. Epidemiological characteristics of an institutional outbreak of cholera. *Trans R Soc Trop Med Hyg* 1987;81:230-2.
10. Rajaratnam G, Patel M, Parry JV, Perry KR, Palmer SR. An outbreak of

hepatitis A: school toilets as a source of transmission. *J Public Health Med* 1992;14:72-7.

11. Noble MA, Isaac-Renton JL, Bryce EA, Roscoe DL, Roberts FJ, Walker M *et al*. The toilet as a transmission vector of vancomycin-resistant enterococci. *J Hosp Infect* 1998;40:237-41.
12. Teare EL, Smithson RD, Efstratiou A, Devenish WR, Noah ND. An outbreak of puerperal fever caused by group C streptococci. *J Hosp Infect* 1989;13:337-47.
13. World Health Organization. WHO Guidelines on Hand Hygiene in Health Care. Geneva: World Health Organization 2009.
14. Pittet D, Hugonnet S, Harbarth S, Mourouga P, Sauvan V, Touveneau S *et al*. Effectiveness of a hospital-wide programme to improve compliance with hand hygiene. Infection Control Programme. *Lancet* 2000, 356:1307-12.
15. World Health Organization. Health-care waste management. Geneva: World Health Organization 2011. (http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs281/en/index.html, accessed on 20 August 2012).
16. Faruque LI, Zaman RU, Alamgir AS, Gurley ES, Haque R, Rahman M *et al*. Hospital-based prevalence of malaria and dengue in febrile patients in Bangladesh. *Am J Trop Med Hyg* 2012;86:58-64.

বাংলাদেশে ম্যালেরিয়া-উপদ্রুত একটি প্রত্যন্ত জেলায় ম্যালেরিয়া রোগী সনাক্তকরণ এবং চিকিৎসায় মোবাইল ফোনের ব্যবহার

বান্দরবান জেলার গ্রামাঞ্চলে সাম্প্রতিক সময়ে শুরু হওয়া মোবাইল ফোনের ব্যবহার ম্যালেরিয়া সার্ভিলেন্স কার্যক্রম উন্নয়নে একটি সুযোগ এনে দিয়েছে। জনস হপকিন্স ম্যালেরিয়া রিসার্চ ইনস্টিটিউট-এর সহযোগিতায় আইসিডিডিআর,বি ২০১০ সালে চলমান প্যাসিভ ম্যালেরিয়া সার্ভিলেন্সে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে জ্বরের খবর পাঠানোর ব্যবস্থা যোগ করেছে। জুন ২০১০ থেকে জুন ২০১২ পর্যন্ত ৯৮৬টি মোবাইল ফোনকল গ্রহণ করা হয়েছে, যার ফলে ১,০৪৬ জন মানুষকে ম্যালেরিয়ার জন্য পরীক্ষা করা হয়েছে এবং এদের ২৬৫ জনের (২৫%) মধ্যে ম্যালেরিয়ার জীবাণু পাওয়া গেছে। প্যাসিভ সার্ভিলেন্সের মাধ্যমে এসময়ের মধ্যে যে ৫০৯ জন ম্যালেরিয়া রোগীর খবর পাওয়া গেছে তাদের মধ্যে ২৬৫ জনের (৫২%) ম্যালেরিয়া পরীক্ষা ও চিকিৎসা শুরুর ক্ষেত্রে একটি মোবাইল ফোন ব্যবহার করা হয়েছে। মোবাইল ফোনের ব্যবহার গবেষণাদলকে রোগী সনাক্তকরণে এবং এলাকার জনগণের চিকিৎসাসেবা নেওয়ার সুযোগ বৃদ্ধি করেছে। মোবাইল ফোনের মাধ্যমে রোগীর খবর সংগ্রহ অন্যান্য দুর্গম এলাকায় ম্যালেরিয়া এবং অন্যান্য জ্বরজনিত অসুস্থতা সনাক্তকরণ ও চিকিৎসা প্রদানে উন্নতিসাধন করতে পারে ।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক ঘোষিত পৃথিবীর ১০৯টি ম্যালেরিয়া-উপদ্রুত দেশের মধ্যে বাংলাদেশ একটি (১)। বাংলাদেশের ম্যালেরিয়া-উপদ্রুত ১৩টি জেলায় আনুমানিক এক কোটি নয়

লক্ষ লোক বাস করে (২)। ২০০৮ থেকে ২০১১ সালের মধ্যে বাংলাদেশে নিশ্চিতভাবে সনাক্তকৃত ম্যালেরিয়া রোগীর সংখ্যা ৮৪,৬৯০ থেকে ৫১,৭৭৩ জনে নেমে এসেছে এবং এ-রোগে মৃত্যুর সংখ্যাও ১৫৪ জন থেকে ৩৬ জনে নেমে এসেছে (২)। তবে জাতীয় এই পরিসংখ্যান বাংলাদেশের সর্বত্র ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা এবং মৃতের সংখ্যার সঠিক ধারণা নাও দিতে পারে। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমের পার্বত্য এলাকায় যেখানে ম্যালেরিয়ার ঝুঁকি সবচেয়ে বেশি এবং সারা দেশের একটি বছরের তালিকাভুক্ত ম্যালেরিয়া রোগী এবং তাদের মৃত্যুর ৮০%-এর বেশি এ-অঞ্চলে ঘটে, সেখানে সার্ভিলেন্সের অভাবে শতকরা দুভাগেরও কম লোককে প্রতিবছর ম্যালেরিয়া সনাক্ত করার জন্য পরীক্ষা করা হয় (৩)।

২০০৯ সালের শেষ দিকে জনস হপকিন্স রিসার্চ ইনস্টিটিউটের সহায়তায় আইসিডিডিআর,বি বাংলাদেশের বান্দরবান জেলার সদর উপজেলার কুহালং এবং রাজবিলা ইউনিয়নে ম্যালেরিয়ার রোগতত্ত্ব বর্ণনা করার জন্য একটি গবেষণা শুরু করে। একশত বাহাত্তর বর্গকিলোমিটারেরও বেশি এলাকা নিয়ে গবেষণাটি পরিচালিত হচ্ছে যেখানে প্রায় ২২,০০০ লোকের বসবাস। এই প্রকল্পের বিস্তারিত বিবরণ পূর্বেই প্রকাশিত হয়েছে (১)। সংক্ষেপে, যেসব উপাত্ত সংগ্রহ করা হয় তাহলো: অ্যাকটিভ ও প্যাসিভ সার্ভিলেন্সের মাধ্যমে ম্যালেরিয়া রোগী সনাক্তকরণ এবং বাৎসরিক জনসংখ্যাতাত্ত্বিক উপাত্ত যার মধ্যে মোবাইল ফোনের মালিকানাসংক্রান্ত তথ্য সন্নিবেশিত রয়েছে।

পাঁচটি দল প্রত্যেক সপ্তাহে ১২টি খানা জনসংখ্যাতাত্ত্বিক জরিপে অন্তর্ভুক্ত করে এবং তাদের মোবাইল ফোন ব্যবহারের সুযোগ আছে কি না তা জানতে চায়। যারা জ্বরের কথা জানিয়েছেন এবং পরবর্তীকালে ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হিসেবে চিহ্নিত হয়েছেন তাদেরকে সনাক্ত করার জন্য প্যাসিভ সার্ভিলেন্স কার্যক্রমে নানা উপায় অবলম্বন করা হয়। কমিউনিটি পরিদর্শনের সময় গবেষণাদলকে প্রায়ই সম্ভাব্য ম্যালেরিয়া রোগীর কথা জানানো হয়েছে। এধরনের একজন সম্ভাব্য রোগীর কথা যখন তাঁরা জানতে পেরেছেন, তখন ম্যালেরিয়া নির্ণয়ের জন্য দ্রুত সনাক্তকরণ পরীক্ষা (র‍্যাপিড ডায়াগনস্টিক টেস্ট) এবং ম্যালেরিয়ার জীবাণু নির্ণয়ের জন্য আণুবীক্ষণিক পরীক্ষা করেছেন। ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত রোগীদেরকে জাতীয় নির্দেশনা অনুযায়ী চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে এবং চিকিৎসা শুরুর পর দ্বিতীয়, সপ্তম এবং ২৮তম দিনে তাদেরকে ফলোআপ করা হয়েছে। ২০১০ সালের জুন মাস থেকে গবেষণা এলাকায় কেউ জ্বরে আক্রান্ত হয়ে থাকলে তা মোবাইল ফোনের মাধ্যমে প্যাসিভ সার্ভিলেন্সে জানানোর জন্য এলাকার জনগণকে অনুরোধ করা হয়। এই প্রতিবেদনের উদ্দেশ্য হচ্ছে প্যাসিভ ম্যালেরিয়া রোগী সনাক্তকরণ বাড়াতে এবং ম্যালেরিয়া রোগীদের সেবা ও চিকিৎসার উন্নতিসাধনে মোবাইল ফোনের ভূমিকা বর্ণনা করা।

আমাদের ২০১১-এর জরিপে খানায় নিজস্ব মোবাইল ফোন আছে কি না জানতে চাওয়া হয়। প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যায় যে, ৪,৬২৮টি খানার মধ্যে ৯৬৮টি (২১%) খানায় অন্তত একটি মোবাইল ফোন ছিলো এবং অন্য ৮১টি (২%) খানায় জরুরি প্রয়োজনের সময় বন্ধু-বান্ধব বা প্রতিবেশীদের মোবাইল ফোন ব্যবহারের সুযোগ ছিলো। কুহালং এবং রাজবিলা এলাকার সবগুলো খানায় আমাদের প্রকল্পকর্মীদের মোবাইল ফোন নম্বর দেওয়া হয় এবং জুন ২০১০ থেকে জুন ২০১২ পর্যন্ত সময়ে তাদের খানায় যদি কারো ম্যালেরিয়া রোগের সাধারণ লক্ষণ, যেমন জ্বর, ঘনঘন বমি-হওয়া, মানসিক অবস্থার পরিবর্তন, খিঁচুনি বা চোখ হলুদ হয়ে-যাওয়া দেখা যায় তাহলে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে তাদের সম্পর্কে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হয়। সার্ভিলেন্স কর্মীরা সম্ভাব্য ম্যালেরিয়া রোগীসম্পর্কিত ৯৮৬টি ফোনের উত্তর দিয়েছেন এবং প্রতিটি কলের বিপরীতে তারা এক বা একাধিক ব্যক্তিকে পরীক্ষা করেছেন। দ্রুত

সনাক্তকরণ পরীক্ষা এবং/অথবা অণুবীক্ষণযন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষায় ১,০৪৬ জনের মধ্যে ২৬৫ জনকে (২৫%) ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত পাওয়া গেছে। মোবাইল ফোনের মাধ্যমে সনাক্তকৃত মোট ২৬৫ জন রোগীর মধ্যে ২২৮ জন (৮৬%) রোগী ম্যালেরিয়ায় সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হওয়ার সময়ে (মে-অক্টোবর) এবং ৩৭ জন (১৪%) ম্যালেরিয়ার প্রকোপ যখন কম থাকে সেই সময়ে (নভেম্বর-এপ্রিল) সনাক্ত হয়েছে। ২০১০ সালের সর্বোচ্চ প্রকোপের সময় ৮৪টি মোবাইল কল থেকে ৩২ জন (৩৮%) ম্যালেরিয়া রোগী নিশ্চিতভাবে সনাক্ত করা গেছে, ২০১১ সালের সর্বোচ্চ প্রকোপের সময় ৫০০টি কল থেকে ১৮০ জন (৩৬%) এবং ২০১২ সালের সর্বোচ্চ প্রকোপের প্রথম দুমাসে ৮৪টি কল থেকে ১৬ জন (১৯%) ম্যালেরিয়া রোগী নিশ্চিতভাবে সনাক্ত করা গেছে।

জুন ২০১০ থেকে জুন ২০১২ পর্যন্ত সময়ে প্যাসিভ সার্ভিলেন্সের মাধ্যমে যে ৫০৯ জন ম্যালেরিয়া রোগী সনাক্ত করা হয় তাদের মধ্যে ২৬৫ জনকে (৫২%) সনাক্ত করা হয় মোবাইল ফোন ব্যবহার করে। মোবাইল ফোন ব্যবহার করে প্যাসিভ রোগী সনাক্তকরণের হার ২০১০ সালের সর্বোচ্চ প্রকোপের সময় ৩০% (১০৭টি মোবইল ফোনকল থেকে ৩২ জন ম্যালেরিয়া রোগী নিশ্চিতভাবে সনাক্ত করা হয়েছে) থেকে ২০১১ সালের সর্বোচ্চ প্রকোপের সময় বেড়ে ৫৯% হয়েছে (৩০৪টি মোবইল ফোনকল থেকে ১৮০ জন ম্যালেরিয়া রোগী নিশ্চিতভাবে সনাক্ত করা হয়েছে)। তবে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ যেসময় কম হয় সেসময়ে এ-হার কমেছে, ২০১০ সালের নভেম্বর থেকে ২০১১ সালের এপ্রিল পর্যন্ত সময়টিতে এ-হার ছিলো ৫২% (৩৩টি মোবাইল ফোনকল থেকে ১৭ জন ম্যালেরিয়া রোগী নিশ্চিতভাবে সনাক্ত করা হয়েছে), যা ২০১১-২০১২ সালের একই সময়ে ৪৩%-এ নেমে আসে (৪৬টি মোবাইল ফোনকল থেকে ২০ জন ম্যালেরিয়া রোগী নিশ্চিতভাবে সনাক্ত করা হয়েছে) (চিত্র ১)।

চিত্র ১: জুন ২০১০ থেকে জুন ২০১২ পর্যন্ত বাংলাদেশের বান্দরবান জেলার কুহালং এবং রাজবিলায় প্যাসিভ সার্ভিলেন্সে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে অথবা মোবাইল ফোন ছাড়া সনাক্তকৃত ম্যালেরিয়া রোগীর সংখ্যা

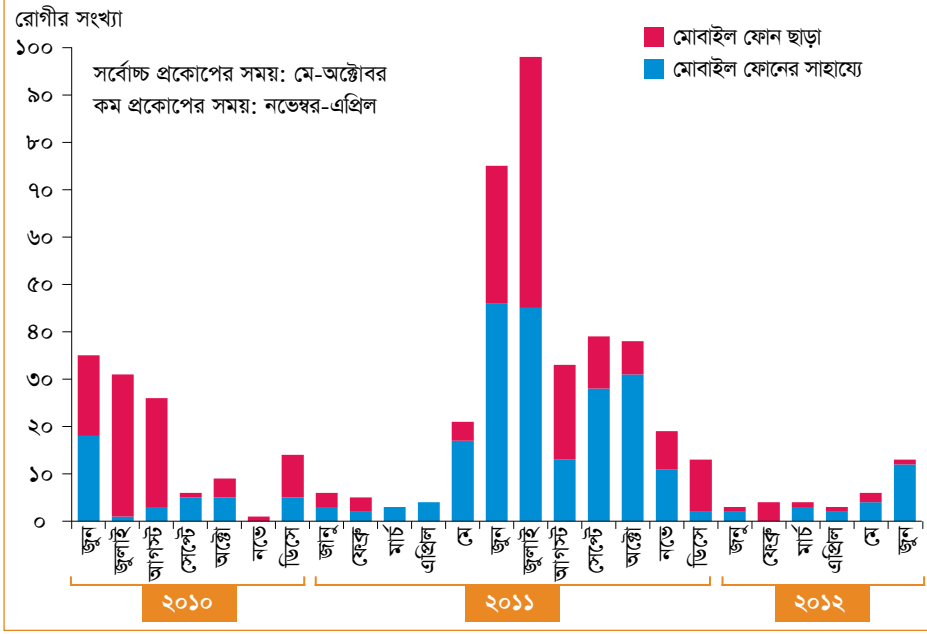

প্রতিবেদক: আইসিডিডিআর,বি এবং জনস হপকিন্স ম্যালেরিয়া রিসার্চ ইনস্টিটিউট

অর্থানুকূল্য: জনস হপকিন্স ম্যালেরিয়া রিসার্চ ইনস্টিটিউট, জনস হপকিন্স ব্লুমবার্গ স্কুল অব পাবলিক হেলথ, বাল্টিমোর, মেরীল্যান্ড, যুক্তরাষ্ট্র

মন্তব্য

যদিও কুহালং এবং রাজবিলার বেশিরভাগ খানাতে (৭৭%) মোবাইল ফোন ব্যবহারের সুযোগ ছিলো না বলে জানা গেছে, তথাপি ম্যালেরিয়ার প্রকোপের সর্বোচ্চ সময়ে মোবাইল ফোন ব্যবহার করে ছয়গুণ বেশি ম্যালেরিয়া রোগী নিশ্চিতভাবে সনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে। ২০১০ সালের সর্বোচ্চ প্রকোপের সময়ে যা ছিলো ৩২ জন, তা ২০১১ সালের একই সময়ে বেড়ে হয় ১৮০ জন, যা থেকে বোঝা যায় যে, এই বছরগুলোতে মোবাইল ফোন ব্যবহারের মাধ্যমে ম্যালেরিয়া রোগী সনাক্তকরণ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এই গবেষণা থেকে দেখা যায় যে, ম্যালেরিয়া রোগী সনাক্তকরণে এবং সংক্রমণ হ্রাসে মোবাইল ফোন একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। ম্যালেরিয়ার সেবা এবং চিকিৎসা যেহেতু এর সংক্রমণ সনাক্তকরণের ওপর নির্ভর করে, সেহেতু ম্যালেরিয়া রোগীর খবর পাওয়ার জন্য প্যাসিভ সার্ভিলেন্সে মোবাইল ফোনের ব্যবহার অন্তর্ভুক্ত করায় রোগীদের যথাযথ চিকিৎসাসেবা নেওয়ার সুযোগ বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়। এছাড়া, চিকিৎসার ফলাফল জানা এবং রোগীদের ফলোআপ করার জন্যেও মোবাইল ফোন ব্যবহার করা যেতে পারে। ম্যালেরিয়া সনাক্তকরণে মোবাইল ফোন একটি গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্র হতে পারে এবং মোবাইল ফোনের মালিকের সংখ্যা আশানুরূপভাবে বৃদ্ধির মাধ্যমে আরো অধিকসংখ্যক ম্যালেরিয়া রোগী সনাক্ত করে তাদেরকে চিকিৎসাসেবা দেওয়া যাবে বলে আমরা আশা করি।

এই এলাকায় সম্প্রতি পরিচালিত একটি গবেষণায় দেখা গেছে যে, বাংলাদেশ জাতীয় ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি কর্তৃক বিনামূল্যে ম্যালেরিয়ার চিকিৎসা প্রদান করা সত্ত্বেও এখানকার অধিবাসীরা রোগ নির্ণয় ছাড়াই সরাসরি ওষুধ বিক্রেতাদের কাছ থেকে ওষুধ কিনতে বেশি পছন্দ করেন (৪)। এর ফলে ম্যালেরিয়ার চিকিৎসায় ব্যবহৃত ওষুধের অকার্যকারিতা বেড়ে যেতে পারে। তবে রোগীরা যদি জানেন যে, একটি মোবাইল ফোনকলের মাধ্যমে তারা দ্রুত এবং কার্যকর সেবা পেতে পারেন তবে তারা ওষুধ বিক্রেতাদের কাছ থেকে চিকিৎসাসেবা নেওয়ার ব্যাপারে কম আগ্রহী হতে পারেন। ফলে ম্যালেরিয়ার চিকিৎসায় ব্যবহৃত ওষুধের বিরুদ্ধে জীবাণুর প্রতিরোধক্ষমতা (রেজিস্ট্যান্স) নিয়ন্ত্রণে রাখা যেতে পারে।

আমাদের গবেষণায় অন্ততপক্ষে দুটি সীমাবদ্ধতা ছিলো। প্রথমত, আমরা মাত্র দুটি ইউনিয়নের উপাত্ত তুলে ধরেছি। ফলে আমাদের গবেষণার এই ফলাফল বাংলাদেশের সব এলাকার জন্য সর্বজনীন নাও হতে পারে। দ্বিতীয়ত, যেহেতু ২৫%-এরও কম জনগণের নিজেদের মোবাইল ফোন আছে অথবা ব্যবহারের সুযোগ আছে, সেহেতু আমাদের গবেষণায় প্যাসিভ সার্ভিলেন্সের মাধ্যমে সনাক্তকৃত ম্যালেরিয়া রোগীর সংখ্যা প্রকৃত সংখ্যা থেকে এখনো কম হতে পারে, এমনকি মোবাইল ফোনের মাধ্যমে খবর জানানোর বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করার পরও।

বাংলাদেশ সরকারের ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি আটটি উপজেলায় (ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা, শেরপুর এবং কুড়িগ্রাম জেলার প্রত্যেকটি থেকে দুটি করে উপজেলা) যেখানে ২০১২ সালের শেষদিকে ম্যালেরিয়ার বিস্তার কম দেখা যায় (<১%), সেখানে ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রেণের জন্য একটি ম্যালেরিয়া প্রাক-নির্মূল কর্মসূচি বাস্তবায়নের পরিকল্পনা করছে। আলোচ্য গবেষণার ফলাফল থেকে বোঝা যায় যে, বাংলাদেশের প্রত্যন্ত

জেলাসমূহে, বিশেষ করে পার্বত্য জেলাগুলোতে, জ্বরজনিত রোগের খবর পাঠানোর জন্য মোবাইল ফোনের ব্যবহার বাড়ানো সম্ভব এবং এর মাধ্যমে ম্যালেরিয়া রোগী সনাক্তকরণ উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়তে পারে। তাছাড়া, বাংলাদেশের দুর্গম এলাকায় যেখানে খরচ এবং ভৌগলিক দুরত্বের জন্য চিকিৎসাসেবা প্রাপ্তির সুযোগ সীমিত সেখানে এজাতীয় সার্ভিলেন্সের মাধ্যমে অন্যান্য রোগ সনাক্তকরণও বৃদ্ধি করা যেতে পারে। এই এলাকায় এবং অন্যান্য দুর্গম এলাকায় মোবাইল ফোনের আওতা বৃদ্ধির জন্য নীতিনির্ধারক এবং মোবাইল ফোন কোম্পানিগুলোর মধ্যে একটি আলোচনার সূত্রপাত হতে পারে, যা জনস্বাস্থ্যের জন্য উপকারী হতে পারে।

References

1. Khan WA, Sack DA, Ahmed S, Prue CS, Alam MS, Haque R *et al*. Mapping hypoendemic, seasonal malaria in rural Bandarban, Bangladesh: a prospective surveillance. *Malar J* 2011;10:124.
2. Malaria and other vector borne disease control programme. *In*: Bangladesh. Ministry of Health and Family Welfare. Directorate General of Health Services. Annual Report 2011: Communicable Disease Control (CDC) Bangladesh. Dhaka: Disease Control Unit. Directorate General of Health Services. Ministry of Health and Family Welfare, Government of the People's Republic of Bangladesh, 2012:4,15.
3. World Health Organization. Malaria Situation in SEAR countries. Geneva: World Health Organization, 2012. (http://www.searo.who.int/en/Section10/Section21/Section340_4015.htm, accessed on 16 September 2012).
4. Haque U, Hashizume M, Sunahara T, Hossain S, Ahmed SM, Haque R *et al*. Progress and challenges to control malaria in a remote area of Chittagong hill tracts, Bangladesh. *Malar J* 2010;9:156.

সর্বশেষ সার্ভিলেন্স

স্বাস্থ্য ও বিজ্ঞান বার্তার প্রতিসংখ্যায় পূর্ববর্তী সংখ্যায় প্রদত্ত সার্ভিলেন্স-বিষয়ক উপাত্তের হালনাগাদ তথ্য পরিবেশন করা হয়। এই হালনাদাগকৃত সারণি এবং চিত্রগুলোতে প্রকাশনাকালীন সময়ে প্রাপ্ত সর্বশেষ সার্ভিলেন্স কর্মসূচির তথ্যগুলো তুলে ধরা হয়। আমরা আশা করছি, বাংলাদেশে রোগ বিস্তারের বর্তমান ধরন এবং রোগের ওষুধ-প্রতিরোধ সম্পর্কে আগ্রহী স্বাস্থ্য গবেষকদের কাছে এই তথ্যগুলো সহায়ক হবে।

জীবাণুনাশক ওষুধের প্রতি ডায়রিয়া জীবাণুর সংবেদশীলতার অনুপাত: সেপ্টেম্বর ২০১১-আগস্ট ২০১২

জীবাণুনাশক ওষুধ	*শিগেলা* (সংখ্যা=৬৯)	*ভি. কলেরি ও১* (সংখ্যা=৩৮৬)
ন্যালিডিক্সিক এসিড	পরীক্ষা করা হয় নি	পরীক্ষা করা হয় নি
মেসিলিনাম	৮৪.১	পরীক্ষা করা হয় নি
এম্পিসিলিন	৫৬.৫	পরীক্ষা করা হয় নি
টিএমপি-এসএমএক্স	২৪.৬	২.১
সিপ্রোফ্লোক্সাসিন	৫৮.০	১০০.০
টেট্রাসাইক্লিন	পরীক্ষা করা হয় নি	১৪.৮
এজিথ্রোমাইসিন	৭৭.৯	৯৯.৭
সেফট্রিয়াক্সোন	৯৮.৫	পরীক্ষা করা হয় নি

প্রতিমাসে প্রাপ্ত ভি. কলেরি ও১, শিগেলা, রোটাভাইরাস এবং ইটিইসি-এর তুলনামূলক চিত্র: সেপ্টেম্বর ২০১১-আগস্ট ২০১২

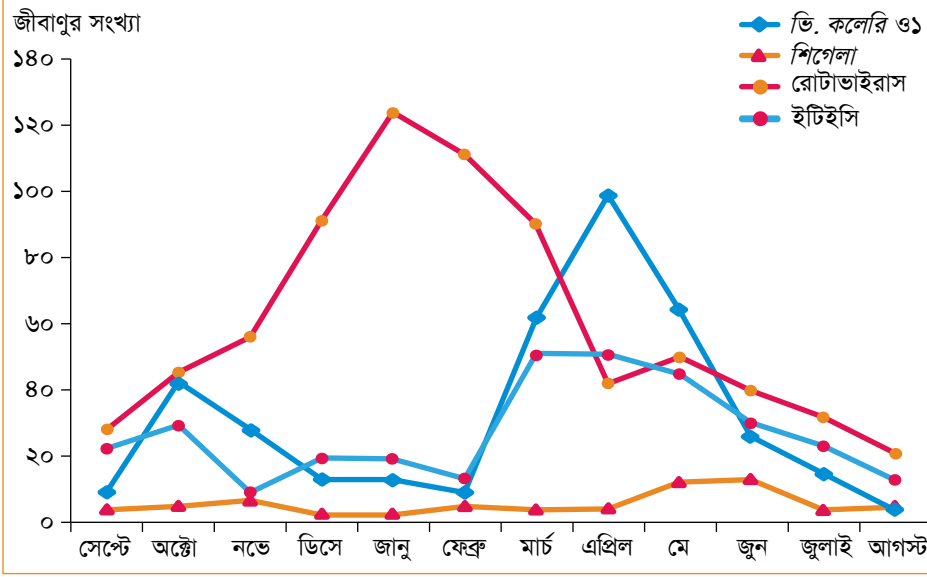

ওষুধের বিরুদ্ধে ১৩টি এম. টিউবারকিউলোসিস জীবাণুর প্রতিরোধের ধরন: মে ২০১১-ফেব্রুয়ারি ২০১২

ওষুধ	প্রতিরোধের ধরন		মোট সংখ্যা=১৩ (%)
	প্রাথমিক সংখ্যা=১২ (%)	একোয়ার্ড* সংখ্যা=১ (%)	
স্ট্রেপটোমাইসিন	৬ (৫০.০)	০ (০.০)	৬ (৪৬.২)
আইসোনায়াজিড (আইএনএইচ)	২ (১৬.৭)	০ (০.০)	২ (১৫.৪)
ইথামবিউটাল	০ (০.০)	০ (০.০)	০ (০.০)
রিফামপিসিন	২ (১৬.৭)	০ (০.০)	২ (১৫.৪)
এমডিআর (আইএনএইচ+রিফামপিসিন)	০ (০.০)	০ (০.০)	০ (০.০)
অন্যান্য ওষুধ	৬ (৫০.০)	০ (০.০)	৬ (৪৬.২)

( ) শতকরা হার *একমাস বা তার চেয়ে বেশি সময় ধরে যক্ষার ওষুধ গ্রহণ করেছে

পাঁচ বছরের কম-বয়সী শিশুদের ক্ষেত্রে জীবাণুনাশক ওষুধের বিরুদ্ধে এস. টাইফি জীবাণুর সংবেদনশীলতা: জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১২

জীবাণুনাশক ওষুধ	পরীক্ষিত (সংখ্যা)	সংবেদনশীল সংখ্যা (%)	কম সংবেদনশীল সংখ্যা (%)	রোগ-প্রতিরোধী সংখ্যা (%)
এম্পিসিলিন	৫২	৪৫ (৮৭.০)	০ (০.০)	৭ (১৩.০)
কোট্রাইমোক্সাজোল	৫২	৪৩ (৮৩.০)	০ (০.০)	৯ (১৭.০)
ক্লোরামফেনিকল	৫১	৪২ (৮২.০)	০ (০.০)	৯ (১৮.০)
সেফট্রিয়াক্সোন	৫২	৫২ (১০০.০)	০ (০.০)	০ (০.০)
সিপ্রোফ্লোক্সাসিন	৫২	৩ (৬.০)	৪৯ (৯৪.০)	০ (০.০)
ন্যালিডিক্সিক এসিড	৫২	৩ (৬.০)	০ (০.০)	৪৯ (৯৪.০)

সূত্র: আইসিডিডিআর,বি-র কমলাপুর (ঢাকা) সার্ভিলেন্স এলাকা।

ল্যাবরেটরি পরীক্ষায় নিশ্চিত হাসপাতালে ভর্তি শ্বাসতন্ত্রজনিত মারাত্মক অসুস্থতায় আক্রান্ত রোগী এবং বহির্বিভাগে আগত ইনফ্লুয়েঞ্জার মতো অসুস্থতায় আক্রান্ত রোগীদের হার: সেপ্টেম্বর ২০০৯-আগস্ট ২০১২

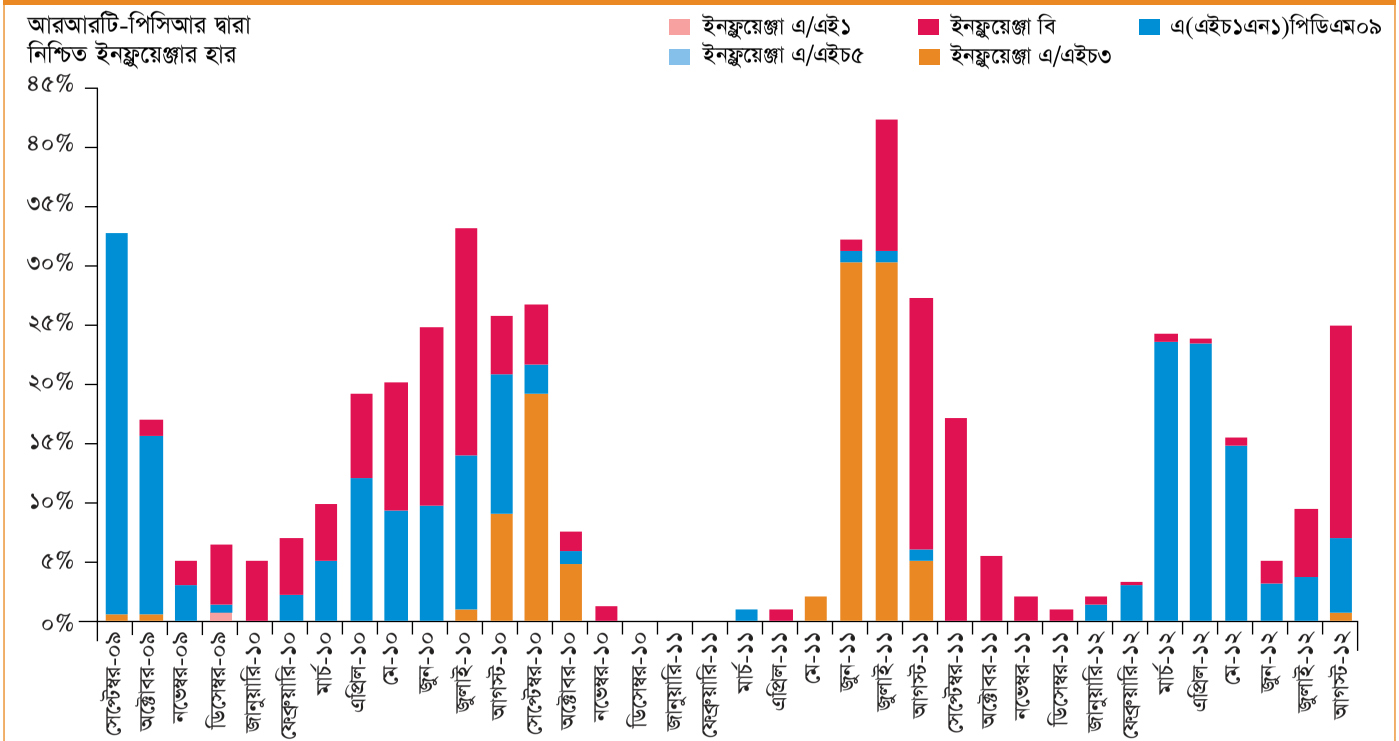

সূত্র: নিম্নোক্ত হাসপাতালসমূহে পরিচালিত ইনফ্লুয়েঞ্জা সার্ভিলেন্সে অংশগ্রহণকারী রোগীদের কাছ থেকে সংগৃহীত: ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, কমিউনিটিভিত্তিক মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল (ময়মনসিংহ), জহুরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল (কিশোরগঞ্জ), রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল (বগুড়া), ল্যাম্ব হাসপাতাল (দিনাজপুর), বঙ্গবন্ধু মেমোরিয়াল হাসপাতাল (চট্টগ্রাম), কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, যশোর জেনারেল হাসপাতাল, জালালাবাদ রাগিব-রাবেয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল (সিলেট) এবং শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল (বরিশাল)।

একটি গ্রামীণ খানায় বাড়ির আঙ্গিনায় হাঁস-মুরগি পালন ও জবাইকৃত মুরগি রান্নার জন্য প্রস্তুতকরণ

আইসিডিডিআর,বি এবং এর যেসব দাতা নিয়ন্ত্রণহীনভাবে এর পরিচালনা এবং গবেষণার কাজে অর্থ সাহায্য করছে তাদের অর্থানুকূল্যে স্বাস্থ্য ও বিজ্ঞান বার্তা-র এ-সংখ্যাটি ছাপা হচ্ছে। বর্তমানে নিয়ন্ত্রণহীনভাবে যারা অর্থ সাহায্য করছে তারা হলো: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, অস্ট্রেলিয়ান এজেন্সি ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট (অসএইড), কানাডিয়ান ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি (সিডা), সুইডিস ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট কো-অপারেটিভ এজেন্সি (সিডা) এবং ডিপার্টমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট (ডিএফআইডি), ইউকে। আমরা কৃতজ্ঞচিত্তে এসব দাতা দেশ ও সংস্থাসমূহের সহায়তা এবং প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করছি।

আইসিডিডিআর,বি
জিপিও বক্স নং ১২৮
ঢাকা ১০০০, বাংলাদেশ
www.icddrb.org/hsb

সম্পাদকমণ্ডলি
জেমস ডি. হ্যাফেলফিংগার
স্টিফেন পি. লুবি
এম. সিরাজুল ইসলাম মোল্লা
এমিলি এস. গারলি
ডরথি এল. সাউদার্ন
মেগান স্কট

অতিথি সম্পাদক
হ্যানা এস. সিনটেক
শরীফা নাসরীন

যাঁরা লেখা দিয়েছেন
১ম নিবন্ধ
আইরিন সুলতানা শান্তা
২য় নিবন্ধ
নাদিয়া আলী রিমি
৩য় নিবন্ধ
ওয়াসিফ আলী খান

কপি সম্পাদনা, সার্বিক ব্যবস্থাপনা ও অনুবাদ
এম. সিরাজুল ইসলাম মোল্লা
মাহবুব-উল-আলম

ডিজাইন ও প্রি-প্রেস প্রসেসিং
মাহবুব-উল-আলম

মুদ্রণে
প্রিন্টলিঙ্ক প্রিন্টারস